কপালে ধুলো মাখা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক

রনধীর পাল

১৪ এ টেমারলেন

কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৯

প্রচ্ছদ শিল্পী

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রণ

তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১।১, দিনবন্ধু লেন,

কলিকাতা-৬

মুনমুন ও সৌমিত্র মিত্রকে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

পরদেশী

আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে

পাখির মা

নীল লোহিতের চোখের সামনে

সেই সময়

পূর্ব-পশ্চিম

জীবনীর দুরকম খসড়া

টেলিফোন কম্পানির দু'জন অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শিবনাথ চমকে উঠলেন। তাঁর ভুরু দুটোতে ঢেউ খেলে গেল।

রাস্তার পাশে অফিসঘর। শিবনাথের টেবিলের উল্টোদিকে গোটা পাঁচেক চেয়ার। তার পেছনে জানলা। সেই জানলার বাইরে দেখা যায় মানুষের চলিষ্ণু স্রোত। রাস্তার লোকদের কতরকম হাঁটার ভঙ্গি, কত বিচিত্র মুখের ভাব, অনেক সময় শিবনাথ সে সব বেশ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করেন। কিন্তু এখন তিনি খুব দরকারি কথা বলছেন, অনেক টাকার কারবার।

তবু শিবনাথ চেঁচিয়ে ডাকলেন, পাঁচকড়ি, পাঁচকড়ি!

ডাক শোনার আগেই পাঁচকড়ি দু'প্লেট কবিরাজি কাটলেট নিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকছিল, সঙ্গে সঙ্গে বললো, এই যে, এনেছি!

শিবনাথ বললেন, শিগগির রাখ! ছাখ ছাখ, রাস্তা দিয়ে সেই ছোঁড়াটা যাচ্ছে, ছুটে গিয়ে ধর, ডেকে নিয়ায়! সেই যে রে, সেই ছোঁড়াটা।

বিশিষ্ট অতিথি দু'জনের দিকে তাকিয়ে বিগলিতভাবে হেসে শিবনাথ বললেন, প্লিজ এক্সকিউজ স্যার···এক মিনিট সার···আপনারা খান স্যার···আমি ওয়ান মিনিট আসছি।

চেয়ার ছেড়ে দ্রুত উঠে গিয়ে শিবনাথ সদর দরজার কাছে গিয়ে ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইলেন।

শিকারী গুলি চালাবার পর তার পোষা কুকুর যেমন ভাবে কিল-এর দিকে ছুটে যায়, পাঁচকড়ি সেইভাবে গিয়ে রাস্তার অনেক মানুষের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিয়ে তার সামনে গিয়ে

দাঁড়িয়েছে।

একটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক, প্যাণ্ট-শার্ট ও চটি পরা, কাঁধে ঝোলানো একটি কাপড়ের থলে, হাতে সিগারেট, তর্ক শুরু করে দিল পাঁচকড়ির সঙ্গে।

সদর দরজার পাশেই একটা টুলে সর্বক্ষণ বসে থাকে দারোয়ান কাবুল সিং। সেও ব্যাপারটা দেখছে। শিবনাথ তার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাতেই সে দৌড়ে গেল পাঁচকড়িকে সাহায্য করতে।

পাঁচকড়ি গায়ে হাত দেয়নি, কিন্তু কাবুল সিং গিয়েই যুবকটির একটা হাত চেপে ধরলো, তারপর টানতে টানতে নিয়ে আসতে লাগলো এদিকে।

শিবনাথ সন্তুষ্ট হয়ে হাসলেন। মাকড়শার জালে যেন একটা হৃষ্টপুষ্ট পোকা ধরা পড়েছে।

শিবনাথের অফিস ক্লার্ক ব্রজেনও ঘটনাটি দেখার জন্য উঠে এসেছে। সে বললো, ছেলেটা আবার এই রাস্তা দিয়েই বুক ফুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে? সাহস আছে তো!

শিবনাথ বললেন, যা বলেছিস! ওকে তোদের ঘরে বসিয়ে রাখ। আমি আগে সাহেবদের সঙ্গে কাজের কথা সেরে নিই!

টেলিফোন কম্পানির একজন অফিসার শিবনাথ ফিরে আসার পর বললেন, আবার এসব খাবার দাবার আনালেন কেন? আমরা এখন এসব কিছু খাবো না।

শিবনাথ বললেন, এ তো অতি সামান্য স্যার। বিকেলের জলখাবার। প্রথম দিন আমার এখানে এলেন, একটু মিষ্টিমুখ করবেন না?

অন্য অফিসারটি বললো, কিন্তু আপনি যে কোটেশান দিচ্ছেন, তাতে তো কাজটা আপনার এখান থেকে করাতে পারবো না মনে হচ্ছে।

শিবনাথ বললেন, কাজ না হয় না হবে। সেটা বড় কথা নয়। নট বিগ ওয়ার্ড! আপনারা আমার প্রেসে পায়ের ধুলো দিয়েছেন,

এই তো যথেষ্ট। ভেরি গুড এনাফ্।

পাঁচকড়ি আবার দু'প্লেট ভর্তি সন্দেশ নিয়ে এলো। টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে সে শিবনাথের দিকে 'চোখের ইঙ্গিতে জানালো যে তাঁর আদেশটি যথারীতি পালিত হয়েছে।

একজন অফিসার আঁতকে উঠে বললেন, আবার এত মিষ্টি? না, না, এসব নিয়ে যান। আমার ব্লাড সুগার আছে, আমি মিষ্টি খাই না!

শিবনাথ বললেন, একটু মুখে দিন। কোন্ বাঙালীর না ব্লাড সুগার থাকে! তা বলে বৌবাজারের কালাকাঁদ খাবেন না? এমন তালশাঁস সন্দেশ আপনি আর কোথাও পাবেন! খেয়ে নিন্ রাত্তিরে ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যাবে।

অন্য অফিসারটি লুব্ধের মতন মিষ্টিগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো, এখনো এত বড় বড় সাইজের সন্দেশ পাওয়া যায়।

প্রথম অফিসারটি সাবধানে একটা সন্দেশ ভেঙে মুখে দিয়ে বললেন, তা হলে মিস্টার ধর, আপনি আর বেশি রিবেট দিতে পারবেন না?

শিবনাথ দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, নো স্যার। আমি এক কথার মানুষ। আমি কি নিজে থেকে আপনাদের কাছে কাজ চাইতে গেছি, না কোটেশান দিইচি? আপনারা ঠেকায় পড়ে এয়েচেন। আমার যদি না পোষায় কী করে কাজটা করবো!

নতুন টেলিফোন ডিরেকেটরি ছাপা হচ্ছিল অন্য প্রেসে। হঠাৎ সেই প্রেসে ধর্মঘট ও লক আউট হয়ে গেছে। এদিকে এ মাসের আঠাশ তারিখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসছেন, সেদিনই আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ডিরেকটরি ছাড়ার কথা। অফিসার দু'জন এসেছেন শিবনাথের প্রেস থেকে অন্তত কিছুটা অংশ ছাপিয়ে নিতে। তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকার কাজ।

দু'প্লেট সন্দেশই নিঃশেষ হয়ে গেছে। অতি উপাদেয় মিষ্টি। কাটলেট দুটিও সুস্বাদু। দ্বিতীয় অফিসারটি অনেকটা নরম হয়ে এসেছে, কিন্তু প্রথম অফিসারটি এখনো জেদ ধরে আছে।

চা খাওয়ার পর প্রথম অফিসারটি বললেন, মিঃ ধর, আপনি যদি পাঁচ পার্সেন্টের বেশি রিবেট দিতে না পারেন, তা হলে কিন্তু আমাদের আবও দু'এক জায়গায় খোঁজ নিতে হবে। আগে আমরা টেন পার্সেন্ট পেয়েছি!

শিবনাথ বললেন, আগেকার কথা বাদ দিন। সব জিনিসের দাম বাড়ে নি? এই বছরে তিনবার কাজজের দাম বাড়লো। আপনাদের এ কাজে হাত দিলে আমাকে অন্য কাজ ডিলে করতে হবে, অন্য পার্টিদের কথা দেওয়া রয়েছে।

প্রথম অফিসারটি বললেন, তা হলে মিস্টার ধর, আমরা উঠি? এতসব খাওয়ালেন। অনেক ধন্যবাদ!

শিবনাথ বললেন, কেন ও কথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন, স্যার। আবার আসবেন, এমনিই আসবেন। আমার কাছে ডায়াবিটিসের ভালো মেডিসিন আছে।

দ্বিতীয় অফিসারটি ঈষৎ কাঁচুমাচু ভাবে বললেন, আপনার পাঁচ পার্সেন্টই ফাইন্যাল? অন্য কেউ যদি এর বেশি না দেয়, তা হলে আপনার কাছেই ঘুরে আসবো। আপনার এত বড় প্রেস, ঝটাপট কাজ তুলে দিতে পারবেন, তা জানি। কিন্তু আমাদেরও তো অফিসিয়াল রেকর্ড ঠিক রাখতে হবে।

শিবনাথ দু'জনের চোখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে ফিক করে হেসে বলেন, ঘুরে আসুন, পাঁচ জায়গা দেখে আসুন গে। বাজার কী রকম টাইট বুঝতে পারবেন। আপনাদের তো নিজেদের টাকা নয় কো, সরকারি টাকা। আমি ফাইন্যাল কথা বলে দিচ্ছি, স্যার! আপনার অফিসকে আমি পাঁচ পার্সেন্টের বেশি দোবো না! বিলের

টাকা যদি তাড়াতাড়ি আদায়ের গ্যারান্টি ছান, তা হলে আরও আড়াই পার্সেণ্ট আলাদা করে নগদানগদি হাতে তুলে দোবো!

দু'জন অফিসারই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। দু'জনেই মনে মনে দ্রুত হিসেব কষছেন, তিন লাখ পঁচাত্তর হাজারের আড়াই পার্সেণ্ট কত হয়।

প্রথম অফিসারটি তবু অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, আড়াই পার্সেণ্ট আলাদা করে দেবেন মানে? বিলে রেকর্ড রাখতে হবে তো!

শিবনাথ মুখখানা ঝুঁকিয়ে এনে দুষ্টুমির সুরে বললেন, আড়াই পার্সেণ্ট ক্যাশ, নো রেকর্ড। সে টাকার কে কী নেবে, তা আপনারা বুঝবেন।

দু'জন অফিসারই বসে পড়লেন আবার।

শিবনাথ এবার চেয়ারে মাথা হেলিয়ে বললেন, যান, পাঁচ জায়গা ঘুরে কে কী ছায় দেখুন! কার কাছে কেমন কাজ পাবেন সেটা বুঝুন। থিংক করুন বাড়িতে গিয়ে। কাল সকালে এসে আমায় জানাবেন। তাড়া কিছু নেই।

এরপর আরও পনেরো মিনিট আলোচনা চললো।

তারপর অফিসার দু'জনকে সদর পর্যন্ত এগিয়ে শিবনাথ হাঁক দিলেন, পাঁচকড়ি!

পাঁচকড়ি এবার প্লেটে শিবনাথের জন্য দু'খানা কাটলেট নিয়ে এলো।

শিবনাথ বললেন, ছোঁড়াটা পালায় নি তো! নিয়ে আয় এখেনে!

কাবুল সিং প্রায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলো ছেলেটিকে। সে রাগে ফুঁসছে।

ছেলেটার রোগা টিংটিংঙে চেহারা, কণ্ঠার হাড় দুটো বিদ্রোহী

ধরনের। তার নীল রঙের জামাটি অতি মলিন, ছিঁড়ে গেছে কয়েকটা জায়গায়, কলারের দুটি কোণ মনে হয় দাঁতে কামড়ানো। তার কাঁধে ঝোলা থলেটাও ফুটো, তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে কাগজপত্র।

এত রোগা হলেও ছেলেটির গলার আওয়াজের বেশ জোর আছে। সে বললো, আপনার লোক আমার গায়ে হাত দিয়েছে কেন? আমাকে জোর করে ধরে রেখেছে। এটা কি মগের মুল্লুক নাকি?

শিবনাথ কাঁটা-চামচ ব্যবহার করেন না। হাত দিয়ে খানিকটা কাটলেট মুখে পুরে বললেন, গায়ে হাত দেবে না তো কি গলায় মালা পরাবে? ফুল-চন্নন দিয়ে বরণ করবে। এখান দিয়ে পালাচ্ছিলে কেন?

ছেলেটি বললো, পালাবো কেন? কর্পোরেশনের রাস্তা দিয়ে যে-কেউ হেঁটে যেতে পারে। তাতে কার কী বলবার আছে?

শিবনাথ কপাল কুঁচকে বললেন, অ, কর্পোরেশনের রাস্তা। আমায় দেখে অমনি মুখখানা ফিরিয়ে নেওয়া হলো। ভেবেছিলে আমি চিনতে পারবো না, তাই না? এই শিবনাথ ধরের চোখকে কোনো শালা আজ পর্যন্ত ফাঁকি দিতে পারেনি। আমার টাকা দাও নি কেন? পাঁচ মাস আগে, কালকেই দিয়ে যাচ্ছি বলে ভেগে পড়লে!

ছেলেটি বললো, আমার আর একজন বন্ধুর টাকা দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সে দেয় নি।

—তোমার বন্ধু টাকা দিয়েচে কি দ্যায় নি, তা তুমি জানো না? তবে সে তোমার কেমন ধারা বন্ধু?

—না, মানে, আমার এক বন্ধু মহীতোষ সব টাকাটা শোধ করে দেবে বলেছিল।

—ওসব বন্ধু-ফন্ধু আমায় দেখিও না! তুমি অর্ডার প্লেস

করেছিলে, দিনের পর দিন তুমি এখানে বসে প্রুফ দেখেছো, ছাপা হবার পর তুমি মাল ডেলিভারি নিয়েচো! টাকা আমি তোমার কাচ থেকে বুঝে নেবো। বন্ধু-ফন্ধু আমি বুঝি না!

—দেখুন, সত্যি কথা বলছি, আমাদের ম্যাগাজিনটা বিক্রি হয় নি। একটা সংখ্যা বার করেই উঠে গেল। দু'জন বন্ধু সাহায্য করবে বলেছিল।

—ওসব সাতকাহন শুনে আমার কী লাভ? আমি কাগজ ছেপে দিইচি, আমার ন্যায্য টাকা পাওয়া নিয়ে কতা! আমি কি এখেনে দানছত্তর খুলে বসিচি!

—দুটো অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ছিল, তারও টাকা পাইনি এখনো। সেই টাকাটা যোগাড় করতে পারলেই।

—ততদিন আমি হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবো? একি মামার বাড়ি পেয়েচো? সাতশো আশি টাকা। পূরোটা না মিটিয়ে দিলে তোমাকে আজ ছাড়চি না চাঁদু!

—আমাকে জোর করে ধরে রাখবেন নাকি?

—এখেনে কেন ধরে রাখবো? তোমাকে পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করবো।

টাকা না পেলে আপনি বড় জোর আমার নামে মামলা করতে পারেন। পুলিশে ধরাবার কোনো রাইট নেই আপনার। আমি কোনো ক্রিমিনাল অফেন্স করিনি!

—আমাকে মামলার ভয় দেখাচ্ছো? হেলে সাপের আবার কুলোপানা চক্কর? সাত শো আশি টাকার জন্য আমি মামলা করতে যাবো? তার আগে তোমার গুষ্টির তুষ্টি নাশ করে দিতে পারি তা জানো? শিবনাথ ধরকে তুমি চোনো নি!

—না না, আপনাকে আমি ভয় দেখাইনি। শুধু বলছিলাম যে টাকা না দিতে পারলেও পুলিশের হাতে দেবার কোনো আইন

নেই। আমি তো চুরি করিনি!

এই সময় হুড়মুড় করে গোটা চার পাঁচ পাড়ার ছেলে ঢুকে পড়লো ঘরে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এরা 'পাড়ার ছেলে' এবং বারোয়ারি পুজো করে। একজনের মাথার চুল সিঙ্গাড়ার মতন এক হাতে লোহার বালা, সে-ই দলপতি।

দলপতিটি বললো, এই যে শিবুদা, আমরা শনি পুজো কচ্চি, তোমার চাঁদাটা কিন্তু এখানো পাইনি। ফটিকবাবু আমাদের বারবার ঘোরাচ্চে।

শিবনাথ বললেন গত হপ্তায় তো কী যেন পুজো করলি, ওলাইচণ্ডী। আবার এ হপ্তায় শনি পুজো। চাঁদা নিয়ে নিয়ে তোরা কি আমায় ফতুর করবি?

দলপতি বললো, এসব তো পাড়ার লোকের ভালোর জন্যই করচি, না কি? তুমিই বলো- এ বছর পাড়ার মধ্যে কোনো বাড়িওলা ভাড়াটের ঝগড়া কিংবা পুলিশ কেস হয়েচে?

শিবনাথ তাঁর কেশিয়ারের উদ্দেশ্যে হাঁক দিলেন, ফটিকবাবু, এদের একান্নটা টাকা দিয়ে দিন তো!

--পঞ্চাশ টাকায় এবার হবে না শিবুদা!

—পঞ্চাশ বলিনি, একান্ন বলিচি!

—ওতেও হবে না। মাইক ভাড়া অনেক বেড়ে গ্যাচে!

—বাজে বকবক করিস নি। আমি এখন বিজি। যা দিচ্চি, তাই নিয়ে এখন ভাগ তো!

দলপতিটি অন্যদের দিকে তাকিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে নিল। তারপর এক পা এগিয়ে এসে, ঠিক হুমকি নয়, বরং আবদারের সুরেই বললো, শিবুদা, এবার তোমায় দুশোটা টাকা দিতেই হবে!

এতেই বেশ চটে গিয়ে তিনি বললেন, দিতেই হবে মানে? আমার ইচ্ছে হয় দোবো, না হলে দোবো না। আমার ঠেঙে এক পয়সা

জোর করে আদায় করতে পারবে, এমন হিম্মৎ কারুর হয়নি এ পাড়ায়। আমিও ঢের মাস্তানি করেছি, বুঝলি!

টেবিলের ড্রয়ার খুলে তিনি কুড়ি টাকার নোটের একটা তাড়া বার করে, আঙ্গুলে একটু থুতু লাগিয়ে পাঁচখানা নোট গুনলেন, তার সঙ্গে একটা এক টাকার নোট জুড়ে বিড়বিড় করে বললেন, টাকা নিয়ে তো ফুর্তি ওড়াবি, মদ-গ্যাজা খাবি।

দলপতিটি হেসে বললো, তাতো একটু খাবোই! মাঝে মাঝে একটু ফুর্তি করতে কি আমাদেরও সাধ যায় না?

শিবনাথ বললেন, সিদ্ধি খেতে পারিস না? সিদ্ধির সরবৎ বানাস তো আমায় এক গেলাস দিয়ে যাস!

ছেলেগুলো চলে যাবার পর পাঁচকড়ি এসে কাটলেটের প্লেটটা সরিয়ে সন্দেশের প্লেট রেখে গেল টেবিলে।

স্বার্থপর বাচ্চারা যেমন অন্যদের দেখিয়ে দেখিয়ে ভালো কোন জিনিস খায়, শিবনাথ ঠিক সেই ভঙ্গিতে একটা সন্দেশ নিয়ে, অনেকখানি হাঁ করে একটা সন্দেশ মুখে পুরলেন। তার পর ঢোঁক গিলে রোগা ছেলেটির দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, কী হলো, চুপ মেরে আচো যে! টাকা ছাড়ো, টাকা ছাড়ো! সাতশো আশি টাকা।

ছেলেটি বললো, এক্ষুনি আমি টাকা কোথা থেকে পাবো? শুনুন, শিবুদা।

—শিবুদা? আমি আবার তোমার কোন্ বাপকেলে দাদা হতে গেলুম, অ্যাঁ?

—না, মানে? এই মাত্র ঐ ছেলেগুলো আপনাকে শিবুদা বলে ডাকলো তো!

—ওরা আমার পাড়ার ছেলে। পাড়ার ছেলেরা নিজের ছেলের মতন। ওরা আমাকে যা খুশি ডাকতে পারে তা বলে তুমি দাদা

বলার কে হে? ওসব নখরাবাজি এখানে চলবে না!

—আপনিও তো প্রথম থেকে আমায় তুমি তুমি বলছেন।

—যারা টাকা না দিয়ে পালায়, তাদের সঙ্গে কি আপনি-আজ্ঞে করতে হবে? অ্যাঁ?

আবার একটি বুড়ো মতন লোক ঢুকলো। শিবনাথের ড্রাইভার। সে বললো, গাড়িটার সাইলেন্সার গরবড় করছে। হর্নের একটা কাট আউট কাজ করছে না। ওগুলো দেখিয়ে আনবো?

শিবনাথ বললেন, যা ঘুরে আয়। আটটার মধ্যে ফিরবি।

অন্য ড্রয়ার থেকে এবার তিনি বার করলেন একটা এক শো টাকার নোটের পেল্লায় বাণ্ডিল। তাতে হাজার দশেক আছে অন্তত। তার থেকে পাঁচখানা টেনে বার করে বললেন, টাকাটা নিয়ে যা। ছাখ, কত লাগে।

ড্রাইভার বেরিয়ে যেতেই পাঁচকড়ি আবার এসে বললো, রাত্তিরের বাজার?

শিবনাথ তাকে প্রথম দু'খানা বড় নোট, একটু ভেবে আরও একখানা বার করে বললেন, কাল বিষ্যুদবার, একটা কিনে রাখিস!

পাঁচকড়ি চলে যাবার পর রোগা যুবকটি ফিসফিস করে বললো, আপনার অনেক টাকা। তবু আপনি মাত্র সাত শো আশি টাকার জন্য…।

শিবনাথ বললেন আমার টাকা দেখে তোমার চোখ টাটাচ্চে! এসব কি আমি ফোঁকটে পেয়েচি। রোজগারের টাকা। রক্ত জল করা পরিশ্রমের টাকা। সকাল নটায় প্রেসে আসি, রাত দশটা-এগারোটা বেজে যায় বাড়িফিরতে। তুমিও খেটে রোজগার করো না, কে বারণ করচে বাঙালীর ছেলে ব্যবসা করে খাচ্চি, তোমরা চাও ঠকিয়ে মকিয়ে আমায় সর্বস্বান্ত করতে। বাঙালীর ব্যবসা কি আর সাধে লাটে ওঠে! টাটা-বিড়ালার তো আরও অনেক অনেক বেশি টাকা।

তাদের ঠকাতে পারবে? যাও না, একবার চেষ্টা করো না, দেখি তোমাদের কত মুরোদ! ওরা গোদা পায়ে লাথি মারলেও তোমরা সেই পা চাটবে।

ছেলেটি আপন মনে খানিকটা হেসে বললো, আপনি আমাকে এত কথা শোনাচ্ছেন, আমার দু'জন বন্ধু আমায় ডিচ্ করলো, কাগজটাও চললো না, কিন্তু লোক ঠকানো আমার কাজ নয়।

—তুমি কাগজ ডেলিভারি নেবার সময় বলে যাওনি, কালই এসে সব পেমেন্ট করে যাবে! তোমাদের ভালোমানুষের ছেলে মনে করে আমি ছেড়ে দিইচিলুম, নইলে এসব ছোটখাটো কাজে ফুল পেমেন্ট না পেলে মাল ছাড়ি না।

—তখন ভেবেছিলাম, কলেজ ষ্ট্রিট থেকে টাকাটা পেয়ে যাবো।

—তোমার সঙ্গে ঢের কথা খরচ করিচি। টাকাটা দাও। দাও!

—আমি এখন টাকা কোথায় পাবো? আমার কোনো রোজগারই নেই।

—ঐ যে পাড়ার ছেলেদের দেখলে, ওাদর হাতে যদি তোমাকে তুলে দিই, ওরা পেঁদিয়ে তোমার হাড়গোড় ভেঙে দ করে দেবে। তাই চাও?

—আমাকে মেরে ফেললেও তো এক পয়সা বেরুবে না তাতে আপনার কী লাভ হবে। আপনাকে ফ্র্যাংকলি বলছি, এখন আমার নিজেরই টাকার খুব দরকার। আপনার ধার শোধ করার সাধ্য আমার নেই। আমি গায়ে খেটে আপনার টাকাটা শোধ করার চেষ্টা করতে পারি।

—গায়ে খেটে শোধ করবে মানে? আমি কি ধান-চাষ করি যে তোমাকে মাটি কুপিয়ে দিতে বলবো?

—প্রেসেও তো অনেক রকম কাজ থাকে।

—প্রেসের কাজ আগে শিখতে হয়। তেল-কালি মাখতে হয়।

তোমার মতন ভদ্দরলোকের ছেলেরা তা পারবে না।

—আমাকে একটা প্রুফ রিডারের কাজ দিতে পারেন না? আপনার এখানে যদি আমি একটা চাকরি পাই, তা হলে আপনি মাসে মাসে আমার মাইনে থেকে আপনার টাকাটা কেটে নেবেন।

—তুমি পুরুফ দেখার কাজ করবে? বটে! সেটা বুঝি খুব সোজা! ব্রজেন, এদিকে এসো তো একবার!

শিবনাথ এবার মিষ্টি খাওয়া শেষ করে উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে এলেন। তারপর একটা সিগারেট ধরালেন। তাঁর শরীর প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি, ইদানীং চওড়াও অনেকটা। ধুতি ও সাদা পাঞ্জাবি পরা, পাঞ্জাবির কাঁধের দিকটা হলদে হয়ে গেছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়স হলেও এখনো সবল।

চেয়ারে সোজা হয়ে বসে তিনি ইন্টারভিউ নেবার জন্য তৈরি হলেন। তাঁর সামনে রোগা যুবকটিকে মনে হয় যেন একটা বাজ পাখির মুখোমুখি চড়াই পাখি।

—কদ্দুর লেখা পড়া করা হয়েচে?

—আজ্ঞে আমি পার্ট টু কমপ্লিট করতে পারিনি। হিস্ট্রী অনার্স ছিল।

—তার মানে বি এ ফেল, এই তো? বাড়িতে কে কে আচে?

—বাবা, মা, আর তিনটি ভাই বোন, আমি মেজো।

—বাবা কী করেন?

—একটা সাবানের কারখানায় কাজ করেন। কেরানির কাজ।

—ভাই বোনেরা আর কে কী করে?

—অন্যরা এখনো পড়ছে। দাদা পলিটিক্স করে।

—লাল ঝাণ্ডা? চাকরি বাকরি কিছু করে না?

—এখনো পায়নি কিছু।

—বাড়ি কোথায়?

—গড়িয়ার কাছে।

গড়িয়ার কাছে মানে কোথায়? গড়িয়া কি একটুখানি জায়গা?

—আপনি কি ওদিকটা চেনেন? বোড়াল গ্রামের নাম শুনেছেন? সেই বোড়ালেই আমরা থাকি!

—নিজের বাড়ি?

—আজ্ঞে না। জ্যাঠামশাইয়ের জমিতে দু'খানা ঘর তোলা হয়েছে। জ্যাঠামশাই জমিটা লিখে দ্যান নি।

—হুঁ। বোড়ালে থাকা হয়। বোনেরা কত বড়?

—একটিই বোন, আমার চে দু'বছরের ছোট। সে লেখা পড়ায় বেশ ভালো।

—তুমি এক পয়সা রোজগার করো না, ভ্যারেণ্ডা ভাজো?

—আমি লিখি। বেশি ছাপা হয়নি অবশ্য। একদিন না একদিন নিশ্চয়ই হবে।

—রোজগার নেই, তবু কাগচ ছাপিয়েচো। আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙার মতলবে। তোমার নামটা যেন কী?

—প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত।

—পোসেনজিৎ! এ অবার কী অদ্ভুত নাম! বাপ-মা রেখেচে, না তুমি নিজে বানিয়েচো?

—আপনি ঠিক ধরেছেন তো? আসলে আমার নাম ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত নামে আর একজন লেখে, বেশ নাম-টাম করেছে, সেইজন্য আমি আমার নামটা পাল্টে নিয়েছি।

—হুঁ, এবার দেখি কেমন তুমি পুরুফ পড়তে জানো!

শিবনাথের চেয়ারের পেছন এসে দাঁড়িয়েছে ব্রজেন। তার দিকে ফিরে শিবনাথ বললেন সেই বানান চারটে বলো তো!

একটা রাফ প্যাড প্রসেনজিতের দিকে তিনি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, লেখো।

ব্রজেন বললো, নিউমিসম্যাটিকস!

যুবকটি লিখতে গিয়েও থমকে গেল।

ব্রজেন আবার ধমকের সুরে বললো, অরনিথোলজিস্ট! জাইলোগ্রাফার! পিসিকালচার!

প্রসেনজিৎ হাত গুটিয়ে বললো, এ তো ইংরিজি। আমি ইংরিজি পারবো না, বাংলা প্রুফ দেখতে জানি!

লম্বা ঢেকুর তোলার মতন শব্দ করে শিবনাথ বললেন, ছু-র! বাংলা বাংলা ছাপার সময় তো পাটির লোকরা নিজেরাই পুরুফ দেখে যায়। তার জন্য মাইনে দিয়ে লোক রাখতে যাবো কেন?

ব্রজেন কৌতুক করে বললো, বড়বাবু, জিজ্ঞেস করুন তো, বাংলা সব পারবে? উপচিকীর্ষু, নির্মৎসর, পুংস্কোকিল।

প্রসেনজিৎ এবারও মুখের ওপর জবাব দিতে পারলো না। মাথাটা ঝুকে পড়েছে।

সে মিনমিন করে বললো, বাংলায় কোনো কথাটা শক্ত লাগলে ডিকশনারি দেখে নিতে পারি।

শিবনাথ বললেন, অ, তুমি ডিকশুনারি দেকে দেকে কাজ করবে, আর সেই জন্য আমি তোমাকে পয়সা দোবো! কী মামার বাড়ির আবদার রে! যাও, ক্যানসেল! এখেনে কাজ ফাজ হবে না। আমার টাকা দাও!

প্রসেনজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ঠিক আছে, আমি শিগগির আপনার ধার শোধ করবার চেষ্টা করছি। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি!

শিবনাথ ঠোঁট উল্টে বললেন, তোমার কথার কী মূল্য আছে হে? ঝোলাটা রেখে যাও! টাকা শোধ করে ওটা নিয়ে যাবে।

প্রসেনজিৎ ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললো, এই ঝোলাটা রেখে কী করবেন? এর মধ্যে দামি জিনিস নেই। শুধু কয়েকটা কাগজপত্তর!

—তবু ওটাই রেখে যাও! এই পাঁচকড়ি!

—সত্যি বলছি, এটার মধ্যে কিছু নেই!

তবু পাঁচকড়ি এসে ঝোলাটা চেপে ধরলো। প্রসেনজিৎ জোরাজুরি করলো না, চেয়ে রইলো অসহায় ভাবে।

শিবনাথ বললেন, দে, ওটা আমার কাছে দে!

প্রসেনজিৎ আর্ত গলায় বললো, ওটার মধ্যে একটা চিঠি আছে, সেটা শুধু বার করে নিতে দিন।

শিবনাথ হুঙ্কার দিয়ে বললেন, কিচ্ছু নিতে পারবে না!

—চিঠিটার কোনো দামই নেই কারুর কাছে। শুধু ওটা নিতে দিন।

—তোমার কাছে তো দাম আছে। সেইজন্যই দোবো না। তবে ভেতরের জিনিস কেউ টাচ করবে না। আমার জিম্মায় থাকবে। তুমি টাকা শোধ দিয়ে যাও, তোমার জিনিস ফেরত পাবে! যাও, এখন আর আমার সময় নষ্ট করো না!

তবু কয়েক মুহূর্ত অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো প্রসেনজিৎ।

শিবনাথ উঠে পেছন ফিরে সাড়ম্বরে একটা স্টিলের আলমারি খুলে তার মধ্যে রেখে দিলেন ঝোলাটা।

প্রসেনজিৎ বেরিয়ে যাবার পর তিনি গভীর বিরক্তির সঙ্গে বললেন, হুঁ! ভদ্দরলোকের ছেলে! আমাকে ভদ্দরলোক দেখাচ্চে! আমার বাবা বুঝি ছোটলোক ছিল? তবু আমি তেল কালি মেখে ট্রেড্‌ল্ মেশিন চালাইনি?

॥ ২ ॥

বাংলা দেশে এত গ্রামের মধ্যে বোড়াল গ্রামটি এক সময় খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল পথের পাঁচালির সুবাদে। সত্যজিৎ রায় তাঁর

ফিল্মটির শুটিং করেছিলেন ঐ গ্রামে, নিশ্চিন্দিপুরের বদলে বোড়ালকে এখন মনে হয় অপুর বাল্যজীবনের পটভূমিকা।

বোড়াল অবশ্য তেমন গ্রাম নেই আর, শহর এখন তাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। সেই কাশবন, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, পানা পুকুর এখন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একবার বাস পাল্টেই পেঁীছোনো যায় মধ্য কলকাতায়।

বাঁশদ্রোণীতে শিবনাথ একটি বাগান বাড়ি কিনেছেন। সেখান থেকে বোড়াল সামান্য দূর।

আড়াই বিঘে জমি, ভেতরে একটি সুন্দর ছোট পুকুর, তার চারপাশে অনেক নারকেল গাছ। একতালা টালির শেডের বাংলো। শনিবার সন্ধেবেলা এখানে চলে আসেন শিবনাথ, সোমবার সকালবেলা এখান থেকেই সরাসরি চলে যান তাঁর প্রেসে। সঙ্গে কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গ থাকে। শিবনাথ ভোগী পুরুষ, খাওয়ার-দাওয়ার সময় কয়েকজন ইয়ার-বক্সি না থাকলে ঠিক জমে না।

ইদানীং শিবনাথের নিজের হাতে রান্নার শখ হয়েছে। প্রত্যেক রবিবার সকাল থেকেই তিনি বাংলোর বারান্দায় উনুনের সামনে চেয়ার পেতে বসেন। তারপর শুরু হয় রান্নার তোড়জোড়। চিংড়ি মাছের মালাইকারি, পাঠার মাংসের ভিণ্ডালু, বিরিয়ানি গোস্ত। দুপুর বারোটা থেকে বন্ধুবান্ধবরা আসতে শুরু করে, এক একজন এসে বসা মাত্রই তার হাতে তুলে দেওয়া হয় ভদ্‌কা কিংবা বীয়ার ভর্তি গেলাস প্লেটে মাছ ভাজা। শেষ পর্যন্ত এত পান-ভোজন হয় যে অতিথিরা সবাই গড়াগড়ি যায় প্রায়।

মানুষকে খাওয়াতে-দাওয়াতে, আদর আপ্যায়ন করতে শিবনাথ দরাজ হস্ত। জলের মতন টাকা খরচ করেন। তাঁর বাড়িতে এলে কেউ নিজের প্যাকেটের সিগারেট পর্যন্ত খায় না।

হ্যাণ্ড কমপোজের যুগ তখন শেষ হয়ে আসছে, বড় বড়

কম্পানির কাজ লাইনো ছাড়া হয় না। শিবনাথ চারখানা জার্মান লাইনো মেশিন বসিয়েছেন নিজের প্রেসে, অফসেট কালার মেশিন আনিয়েছেন। সময় মতন নিখুঁত কাজের জন্য শিবনাথের প্রেসের চতুর্দিকে খুব সুনাম। ভালো কাজ দেখিয়ে জার্মান-সোভিয়েত কনসুলেটের প্রচারপত্র এগুলো ছাপার কনট্রাক্ট পেয়েছেন, এই সব বাঁধা কাজে লাভ প্রচুর। শিবনাথ নিজের হাতে প্রেসের সব কাজ করেছেন এক সময়, তাই সব কাজ বোঝেন, তার চোখ ফাঁকি দেবার উপায় নেই। খাটেন দৈত্যের মতন, রোজগার করেছেন দু'হাতে, খরচও করছেন দু'হাতে।

তাঁর প্রেসের অ্যাসেট এখন হবে অন্তত পচিশ-তিরিশ লাখ। শিবনাথ অবশ্য বলেন, আমার এই প্রেসটার দাম মাত্র সাত টাকা!

গাড়ি নিয়ে মাঝে মাঝে শিবনাথ তাঁর বাগানবাড়ি থেকে আরও ভেতরের গ্রামের দিকে বেড়াতে যান। সঙ্গে থাকে পাঁচকড়ি। গ্রামের হাট থেকে টাটকা তরি-তরকারি আর হাঁস-মুরগি কিনতে তিনি ভালোবাসেন। শীতকালে নানারকম পাখিও পাওয়া যায়। পোষার জন্য পাখি নয়, টেব্‌ল বার্ড।

বোড়াল গ্রামের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শিবনাথ হঠাৎ বললেন, এই পেঁচো, গাড়িটাকে সাইড কর। এই মাত্র পাশ দিয়ে যে গেল, ঐ ছোঁড়াটাকে চিনতে পারছিস?

পাঁচকড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, এ তো সেই ছোঁড়াটা। ব্যাগটা ফেরত নিতে তো কই আর এলো নাকো!

শিবনাথ বললেন, দু'হপ্তা পার হয়ে গেল, তাই না? টাকাটা দেবার নাম নেই।

পাঁচকড়ি বললে ওর ঝোলাটার মধ্যে কী আছে দেখেছেন?

শিবনাথ বললেন, না, দেখিনি। মনে হয় ফালতু কাগজপত্তর। থলেটাও ছেঁড়া। দু'পয়সাও দাম হবে না।

পাঁচকড়ি বললো, ও টাকা আর আপনি পাবেন না, বড়বাবু!

শিবনাথ বললেন, তুই আমাকে এই চিনেছিস? গলায় গামছা দিয়ে আদায় করবো। আমায় ঠকিয়ে এ পর্যন্ত কেউ পার পায়নি। সামনের গলি দিয়ে বেরুলো না ছোঁড়াটা?

পাঁচকড়ি বললো, এখানে ওর বাড়ি। গাড়ি ঘুরিয়ে ওকে গিয়ে ধরবো এক্ষুনি?

শিবনাথ বললেন, ও যেখানে যাচ্চে যাক। ওর বাপকে গিয়ে ধরবো। ওর বাড়িটা খুঁজে বার কর। এগিয়ে গিয়ে গলির মধ্যে জিজ্ঞেস কর, দাশগুপ্তদের বাড়ি কোন্‌টা।

শিবনাথ বিড়বিড় করে বললেন, পোসেনজিৎ। না, না, আসল নাম ইন্দরজিৎ, মনে আছে আমার। চ' তো একবার কথা বলে আসি।

গাড়ি থেকে নেমে শিবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, লোকের বাড়িতে কাবলেওলা কেন আসে বল তো?

পাঁচকড়ি বললো, বোধহয় হিং টিং কিংবা মোওয়া বিক্রি করতে আসে।

শিবনাথ বললেন, গবেট হিং বেচতে এলে কি কেউ তাকে বৈঠকখানায় বসায়? নির্ঘাত কাবলের কাছে টাকা ধার করেছে!

পাঁচকড়ি বললো, ঠিক বলেছেন, বড়বাবু! কাবলেটার চোখ মুখ বেশ গরম।

শিবনাথ বললেন, এই করেই তো বাঙালী ডোবে। রোজগার বাড়াতে জানে না, ধার করতে শেখে। পকেটে পয়সা নেই, প্রেস থেকে পত্রিকা ছাপাতে যায়। অত ছোট কাজ আমি নিই না, তিনটে ছোঁড়া গিয়ে এমন কাকুতি মিনতি করছিল, তার মধ্যে এই ইন্দরজিৎ ছোঁড়াটারই উৎসাহ ছিল বেশি। চ', ওর ভিটে মাটি আমি চাঁটি করে দোবো!

জুতো মশ্‌মশিয়ে শিবনাথ এলেন গলির মধ্যে। দোতলা বাড়িটি তিনি ভালো করে দেখলেন!

বেশি দিনের পুরোনো নয়। ওপরের বারান্দা থেকে দুটো শাড়ি ঝুলছে তার মধ্যে একটা শাড়ির আঁচল ছেঁড়া। পাশ দিয়ে যে জলের পাইপ নেমেছে, তার একটা জায়গা ভেঙে হাঁ হয়ে আছে।

বাড়িটার ডান পাশে খানিকটা জমি। কাঠা সাতেক হবে। কিছুটা অংশে বেগুন চারা লাগানো হয়েছে, তার ওপাশে একটা টিনের চালের বাড়ি। সেটারও অবস্থা নড়বড়ে ধরনের।

শিবনাথ সব দেখে সন্তুষ্টভাবে বললেন, হুঁ!

দেতলা বাড়িটার বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো একজন কাবুলিওয়ালা। বিশাল চেহারা, মাথায় সাত পাকে পাগড়ি, মেহেদি রাঙানো গোঁফ। ইদানীং এই চরিত্রগুলো খুব দুর্লভ হয়ে উঠেছে। এই কাবুলিটি বেশ সুসজ্জিত, সুপুরুষ।

ধুতির ওপর গেঞ্জি পরা, টাক মাথা, বেঁটে মতন এক মধ্যবয়স্ক লোক বিগলিতভাবে হেসে হেসে কথা বলছে সেই কাবুলিওয়ালার সঙ্গে।

শিবনাথ পাঁচকড়িকে বললেন, দেখলি, ফিরিওয়ালার কেস নয়। নির্ঘাত ধার করেছে। এইবার মজাটা ছাখ!

কাবুলিওয়ালাটি বিদায় নিতেই শিবনাথ এগিয়ে গিয়ে টাক মাথা ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, নমস্কার। আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি?

ভদ্রলোক খানিকটা সন্দেহের সঙ্গে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে আসছেন? আপনি কি আমায় খুঁজছেন?

শিবনাথ বললেন, আজ্ঞে না আমি এমনিই এপাশে এসেছি জমি খুঁজতে। খানিকটা জমি কিনে একটা বাড়ি করার ইচ্ছে। এই অঞ্চলটা বেশ নিরিবিলি।

ভদ্রলোক বললেন, জমি? মুদিখানায় গিয়ে খোঁজ করুন! ওখানে একজন দালাল বসে। আজকাল অনেকেই কলকাতা থেকে এখানে জমির খোঁজ করতে আসে। কলকাতায় তো আর বাড়ি করার উপায় নেই!

শিবনাথ পাঁচকড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই যা, গাড়িতে গিয়ে বোস। আমি কথা সেরে আসচি। গাড়িতে আমার ব্যাগ আছে, নজর রাখবি।

তারপর ভদ্রলোকের চোখে চোখ রেখে বললেন, ভগবানের দয়ায় আমার কলকাতা শহরে দু'খানা বাড়ি আছে। বৌবাজারে আর মানিকতলায়। আমার ইচ্ছে এখানে একটা ছোট বাড়ি করি, মাঝে মাঝে এসে থাকবো। আজই যদি কোনো জমি পাই, বায়না করে টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে যাবো।

শিবনাথ পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢোকালেন।

ভদ্রলোকটি কোনো উত্তর না দিয়েই তাকিয়ে রইলেন শিবনাথের সেই হাতের দিকে।

শিবনাথ আবার বললেন, আপনার এই পাশের জমিটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। সামনে বারো ফুট রাস্তা। পেছনে কার বাগান। এ জমির মালিককে কোথায় পাবো বলতে পারেন?

ভদ্রলোক বললেন, এ জমি বিক্রি করা যাবে না।

শিবনাথ দু'পা এগিয়ে এসে বললেন আপনার জমি? শুধু শুধু ফেলে রেখেছেন? আজকাল কি কেউ জমি ফেলে রাখে? জমি তো নয়, সোনা। কখন অন্য লোক আঁচল গেরো বেঁধে নিয়ে যাবে, টেরও পাবেন না। বেগুন চাষ করছেন দেখছি। বেগুনের কিলো তিন টাকা। জমি বিক্রি করে সেই টাকা যদি ব্যাঙ্কে ফেলে রাখেন, অনেক বেশি সুদ পাবেন। তাতে যত ইচ্ছে বেগুন খান, তাও ফুরোবে না। এর মধ্যে পাড়ার ছেলেরা যদি ঐ জমিতে ফুটবল ক্লাব কিংবা

লাইব্রেরি বানিয়ে ফেলে, তা হলে কোনোদিন আর তাদের তুলতে পারবেন ?

ভদ্রলোক বললেন, না, পাড়ার ছেলেদের সামলানো যাবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি, আমার এক খুড়তুতো ভাইকে কিছুদিনের জন্য থাকতে দিয়েছিলুম। সে উঠেও যাচ্ছে না, জমিও ছাড়চে না।

শিবনাথ জিভ কেটে বললেন, ছি ছি ছি, করেচেন কি দাদা! এই বাজারে কেউ কারুকে বিশ্বাস করে আপন জমিতে থাকতে দেয় ? কেউ একবার গেড়ে বসলে আর সে জমি ছাড়ে ? সর্বনেশে কাণ্ড করেচেন !

ভদ্রলোক ঠোঁটে তেতো খাওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ব্যাপার। তাড়িয়ে তো দিতে পারি না। বেচে দিতে পারলে অবশ্য ভালো হতো। সময়টা খারাপ পড়েছে। কিন্তু এমন দখল করা জমি কে কিনবে ?

শিবনাথ বললেন, উপায় আচে ! আমি রাস্তা বাতলে দিতে পারি। শুনবেন ?

ভদ্রলোক বললেন, ভেতরে আসুন।

শিবনাথ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, আমার নাম শিবনাথ ধর। প্রেসের ব্যবসা। নিজস্ব বাইণ্ডিংখানা।

ভদ্রলোক বললেন, নমস্কার। আমার নাম জগদীশ দাশগুপ্ত। আমার শেয়ার মার্কেট নিয়ে কারবার।

বৈঠকখানায় এসে বসে শিবনাথ পকেট থেকে বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললেন, আজ্ঞা করুন। আমি ঐ জমি বায়না করে এখনই হাজার তিনেক টাকা ক্যাশ দিয়ে যেতে পারি।

—আপনি জেনেশুনে ঐ জমি কিনবেন ?

—খুড়তুতো ভাইয়ের কাছ থেকে ভাড়া পান কত ? রসিদ দ্যান ?

ভাড়াই নিই না, তার আবার রশিদ ! খুড়তুতো ভাই বললুম

না। ওদের নিজেদের বাড়ি ছিল সোনারপুর। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে সে বাড়ি বেচে দিয়েছে। বছর পাঁচেক আগেকার কথা। তখন আমার মা বেঁচে, মা বললেন আহা, বিশ্বনাথরা কোথায় যাবে, ওদের এখানেই থাকতে দে কটা দিন! মায়ের কথা তো আর ফেলা যায় না।

—তা বেশ করেছেন। বিপদের সময় আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য না করলে কেউ শুধু স্বার্থপর হয়ে সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারে না। তবে সেই সুযোগ নিয়ে কোনো আত্মীয় যদি মাথায় চড়ে বসে, তবে তাকে তক্ষুনি ঝেড়ে ফেলা উচিত। চিরতরে, বুঝলেন!

—সেটাই যে পারছি না! দেখা হলেই কাচুমাচু হয়ে বলে, ছোড়দা, আর একটা বছর সময় দাও!

—আপনার ঐ খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে-মেয়ে নেই? তারা কিছু বলে না? আজকালকার ছেলে মেয়েদের তো এভাবে থাকতে মান-সম্মানে লাগে।

—বিশ্বনাথের বড় ছেলেটা কী সব পলিটিক্স করে শুনেছি। বাড়িতে প্রায় থাকেই না। তার পরের ছেলেটা বি এ পরীক্ষা দিল না, কবিতা-টবিতা লেখে, চাকরি বাকরির কোনো চেষ্টাও করে না। অকালকুষ্মাণ্ড যাকে বলে। বাকিগুলো এখনো ছোট। বিশ্বনাথ একা আর কতদিক সামলাবে!

—এই জন্যই তো বাঙালী জাতটা গেল। বাপের ঘাড়ে বসে বসে বেকার ছেলেরা খাবে। আমি হলে অমন ছেলেদের দূর দূর করে বাড়ি থেকে তাড়াতুম!

—আপনি অ্যাডভান্স দিতে চাচ্ছেন, জমিটা সত্যি কিনবেন? তুলতে পারবেন ওদের!

—তুলবেন আপনিই। আমি পথ বাতলে দিচ্ছি। আমার মানিকতলার বাড়িতেও এক পিসি ছিল। তাঁকেও এই টেকনিকে

হঠিয়েছি। শুনুন। আপনি ভাড়া নেন না, রসিদ দেন না। ওদের জোর করে তুলবেনও না। সব ঠিক আছে। কিন্তু এমন কায়দা করবেন, যাতে নিজেরাই বাপ বাপ বলে উঠে যাবে।

—কী কায়দাটা বলুন তো ?

—ওদের আপনি চলে যেতে বলবেন না মুখ ফুটে, কিন্তু এ কথা তো বলতে পারেন যে, ভাই, আমার এখানে জায়গার বড্ড টানাটানি হচ্ছে, তোমার ওখানে আমার দু'চারটে জিনিস রাখবো ? তাতে কি আপনার খুড়তুতো ভাই অরাজি হবে ?

তা বোধহয় হবে না। কিন্তু কী জিনিস রাখবো ?

—আপনার বাড়িতে পুরোনো, ভাঙা আলমারি নেই ? ছেঁড়া লেপ-তোশক, যা পাবেন, ঢুকিয়ে দিন আমার প্রেসে অনেক আজে বাজে মেসিন পার্টস আছে, সেগুলো পাঠিয়ে দিতে পারি, সেই সব লোহা-লক্কর দিয়ে ভরিয়ে দিন একটা ঘর। বলবেন যে, আপনি লোহার ব্যবসা করছেন। ওদের এক ঘরে ঠেলে দেবার পর একটা গরু কিনুন।

—গরু ?

—হ্যাঁ, গরু তো কিনুন একটা। দরকার হয়, আমি কিনে পাঠিয়ে দোবো। সেই গরুটাকে রাখবেন ওদের ঘরের পেছনেই গোয়াল ঘর-টর কিছু বানাবেন না। তারপর এই তো বর্ষা আসছে। প্রথম বৃষ্টির দিনটাতেই গরুটাকে ঢুকিয়ে দেবেন ওদের শোবার ঘরে। বলবেন, গরু হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবতী। তাকে কখনো সারা রাত বৃষ্টির মধ্যে রাখা যায় !

—তাতে কী লাভ হবে ?

—গরু হচ্ছে মোক্ষম দাওয়াই। গরুর সঙ্গে সঙ্গে অ্যায়সা বড় বড় মশা আসবে। মাছি আসবে। একরকম ছোট ছোট পোকা বসে গরুর গায়ে, ঘর সেই পোকায় ভনভন করবে। তখন এরা

পালাবার পথ পাবে না!

শিবনাথ একগাল হাসলেন। জগদীশ দাশগুপ্ত হাত বাড়িয়ে বললেন, দিন টাকাটা। তিনের বদলে পাঁচ করতে পারেন না? বড্ড অসুবিধের মধ্যে পড়ে গেছি!

খানিকবাদে শিবনাথ খুশিতে ডগোমগো হয়ে গাড়িতে ফিরে এসে বললেন, বোড়ালে আর এক খাস বাড়ি করবো। জমিটা বায়না করা হয়ে গেল। সাড়ে ন'কাঠা জমি, শস্তায় পেয়েচি রে পেঁচো! দশ হাজার করে কাঠা চলবে এ দিকে, আমাকে দিতে রাজি হয়ে গেল হোলসেল বাহাত্তর হাজারে।

পাঁচকড়ি চোখ কপালে তুলে বললো, কাঠা দশ হাজার? গাঁজাখুরি কথা! আমি এখানে একটা মুদিখানায় কথা বললুম, আট হাজার করে জমি পাওয়া যাচ্ছে ঢের। আপনাকে ঠকিয়েচে।

শিবনাথ বললেন, গবেট আর কাকে বলে! সাড়ে ন'কাঠা যদি বাহাত্তর হাজার হয়, তবে ঠকলুম কিসে? হাফ কাঠা ফা!

—জমিতে জবর দখল রয়েচে।

—তিন মাসের মধ্যে তুলে দেবে! ওরা উঠতে বাধ্য।

—তিন মাস আপনার টাকা ফেলে রাখবেন?

—জমিতে টাকা পুতে রাখলে টাকার গাছ হয়। জমির দাম কখনো কমেচে, এমন শুনেচিস? ক্রমশই হু হু করে বাড়বে।

—কিন্তু বোড়ালে জমি কিনে কী হবে? আপনার বাঁশদ্রোণীতে অতবড় বাগানবাড়ি!

—থাক, জমিটা থাক। ইচ্ছে হলে এখানেও একটা ছোট বাড়ি বানাবো।

—বড়বাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? রাগ করবেন না?

—বাজে কোশ্চেন করলে লাথি খাবি। ভালো কিছু থাকলে বল!

—আপনি ঐ ছেলেটার ওপর রাগ করে শুধুমুদু এতগুলো টাকা

গচ্চা দিলেন ? মাত্র সাত শো আশি টাকা, তার জন্য আপনার কত হাজার টাকা গলে গেল !

—সাতশো আশি টাকা তোর কাছে মাত্তর হলো ? খুব নবাব হয়েচিস ! টাকা বুঝি খোলামকুচি ? সাতশো আশিই হোক আর সাত টাকাই হোক, কেউ আমাকে ধোঁকা দিয়ে ঠকাবে, তেমন বাপের ব্যাটা আজও জন্মায় নি। ঐ ছোঁড়াটার বাপ-মা, ভাই-বোনকে আমি ফুটপাথে শোওয়াবো !

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শিবনাথ হঠাৎ যেন অন্য মানুষ গেলেন।

আস্তে আস্তে বললেন, সাত টাকা! সাত টাকাও কি কম ? শুধু সাত টাকা দিয়েও রাজ্য জয় করা যায়।

॥ ৩ ॥

ড্রাইভাটির বয়েস হয়েছে, প্রায়ই অসুখ-বিসুখ লেগে থাকে। চোখেও ভালো দেখে না। তবু তার চাকরি ছাড়ান নি শিবনাথ। কখনো সে অসুস্থ শরীর নিয়ে ডিউটি করতে এলে শিবনাথ তাকে ধমকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। মাইনে কাটেন না। বিষ্টু ড্রাইভারের মেয়ের বিয়ের খরচ তিনি দিয়ে দিয়েছেন। পুরোনো কর্মচারিদের ওপর তাঁর খুব পক্ষপাতিত্ব আছে। যখন তাঁর প্রেস ছোট ছিল, অবস্থাও সামান্য ছিল, তখন থেকেই তো ওরা আছে !

শিবনাথ নিজে গাড়ি চালাতে জানেন। কিন্তু মুশকিল হচ্চে, রাস্তায় কোনো কুকুর, গরু এমনকি বেড়াল দেখলেও তিনি যখন তখন ব্রেক কষে দেবেন ! জন্তু-জানোয়ারদের ওপর তাঁর অসম্ভব মায়া। একবার একটা কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে শিবনাথ এমনভাবে স্টিয়ারিং ঘোরালেন যে গাড়ি গিয়ে ধাক্কা লাগলো ল্যাম্পপোস্টে, শিবনাথের নিজেরই বাঁ-হাতের কব্জীর হাড় ভেঙে গেল। আর একবার তাঁর ড্রাইভার বিষ্টু একটা কুকুরকে চাপা দিয়েছিল বলে শিবনাথ কেঁদে

ভাসিয়ে ছিলেন। পাপ কাটাবার জন্য পুজো দিয়েছিলেন কালীঘাটে।

এই সব কারণে শিবনাথকে আর গাড়ি চালাতে দিতে চান না তাঁর বাড়ির লোকেরা। তাঁর স্ত্রী দিব্যি দিয়েছেন।

নতুন ড্রাইভার রাখার বদলে পাঁচকড়িই ড্রাইভিং শিখে নিয়েছে। পাঁচকড়ি তাঁর প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। বাটলার, প্রাইভেট সেক্রেটারি, ট্রাব্‌ল শুটার, সব এক সঙ্গে।

জার্মান কনস্যুলেট থেকে একটা কাজ সেরে পাঁচকড়িকে নিয়ে ফিরছিলেন শিবনাথ। হঠাৎ তিনি বললেন, গাড়িটা ভিকটোরিয়ার পাশ দিয়ে নিয়ে চল তো!

বিকেল চারটে, কিন্তু আকাশ মেঘলা বলে চতুর্দিকে ছায়া ছায়া ভাব। যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামবে।

ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে গাড়ি থেকে নেমে শিবনাথ বললেন, অনেকদিন খাইনি রে, আজ একটু ফুচকা খাবো!

পাঁচকড়ি আঁতকে উঠে বললো, ফুচকা? আপনার না এসব খেতে বারণ?

শিবনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, ফুচকা খেতে বারণ? কে বলেছে তোকে?

—ডাক্তারবাবু বলেছেন না আপনার রক্তে কোলেস্টারলিং হয়েছে?

—কোলেস্টারলিং না রে গবেট, কোল্ডএস্টোরেজ! গেলুম ডায়াবিটিস হয়েছে কিনা দেখাতে, বলে দিলে কোল্ডএস্টোরেজ। আমার বাপ-ঠাকুর্দার কোনোদিন ওসব জিনিস হয়নি, আমার হলেই হলো!

—ডাক্তারবাবু আপনাকে ডাবল ডিমের মামলেট খেতে বারণ করেছেন!

—তা বলে ফুচকা খাবো না? গুলি মারো ডাক্তারের কথায়। জানিস, যখন আমার দুপুরে ভাত জুটতো না, তখন দু'পয়সার ফুচকা

খেয়ে খিদে মেরেছি। তুই না খাবি তো খাস না।

—আমি দইবড়া খাবো।

—আমিও সেটা খাবো। আগে ফুচকা খেয়েনি।

শালপাতার ঠোঙায় ফুচকাওয়ালা একটার পর একটা দিয়েই যাচ্ছে, শিবনাথের না নেই।

পাঁচকড়ি আর্তভাবে বললো, ও বড়বাবু, আর না, আর না!

শিবনাথ বললেন, চুপ মার!

হঠাৎ শিবনাথের হাতটা থেমে গেল, তিনি মুখ তুলে সামনের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন।

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে প‍াঁচকড়ি দেখলো, ভিকটোরিয়ার বাগানের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে একজোড়া যুবক-যুবতী।

সবাই মেয়েটিকেই আগে দেখে। বেশ ছিপছিপে, দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি, রং মাজা মাজা, মাথায় একরাশ চুল, একটা ঘি রঙের শাড়ি পরা। মেয়েটির চেহারা চোখ টানার মতনই বটে, তা ছাড়া তার পোশাক ও মুখভঙ্গিতে সচ্ছলতার ছাপ স্পষ্ট। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এই ধরনের মেয়েরা বাড়ির গাড়ি নিয়ে নিউ মার্কেটে কেনাকাটা করতে যায় যখন তখন।

তার পাশে প্রসেনজিৎ ওরফে ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত!

ইন্দ্রজিৎ এদের দেখতে পায়নি, সে তার সঙ্গিনীর সঙ্গে হাত-পা নেড়ে গল্পে মত্ত। গেট থেকে বেরিয়ে ওরা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো ডান দিকে।

শিবনাথ বললেন, হায় ভগবান! একটা নিষ্কর্মা, বেকার, জোচ্চোর ছোঁড়া, তার বরাতেও এমন সুন্দরপানা মেয়ে জুটে যায়। এ যে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা।

পাঁচকড়ি চুপ করে ছেলে-মেয়ে দুটির দিকে চেয়ে আছে।

শিবনাথ বললেন, আমার টাকা ফাঁকি দিয়ে প্রেম করা হচ্ছে?

নির্লজ্জ বেহায়া ! এদিকে যে জ্যাঠা দু'দিন বাদেই বাড়ি ছাড়া করবে, মা-বাপ পথে বসবে, সে হুঁশও নেই ! এই জন্যই তো বাঙালী জাতটা উচ্ছন্নে যায়।

পাঁচকড়ি তবু কোনো সাড়া শব্দ করছে না দেখে শিবনাথ আবার বললেন, ছুটে গিয়ে ওর কলারটা চেপে ধরবি নাকি ? বলবি, শালা, আমাদের টাকা না দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস, দে টাকা দে। অমনি দেখবি প্রেম একেবারে ছেরকুট্টে হয়ে যাবে। মেয়েটা নিশ্চয়ই ওর আসল রূপটা জানে না।

পাঁচকড়ি বললো, মেয়েটাকে তো চিনি !

শিবনাথ একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। ঐরকম চেহারার মেয়েদের তো পাঁচকড়ির মতন মানুষদের চেনার কথা নয়।

—তুই চিনিস ? কী করে চিনলি ? মেয়েটা কে ? লাইনের মেয়ে ?

—না, না। চিনি মানে কি, দেখেছি। আমাদেরই পাড়ার মেয়ে।

—পাড়ার মানে, বেলেঘাটার মেয়ে ?

—না, বড়বাবু। আমাদের প্রেস পাড়ার। গলিটা যেখানে বড় রাস্তায় পড়ে, তার উল্টো দিকেই যে একজন উকিলের বাড়ি, সে বাড়ির মেয়ে। ওর বাবা খুব বড় উকিল, হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে। মেয়েটা পড়ে উনিভার্সিতে। প্রায়ই বাসে উঠতে দেখি।

—উকিলবাবু প্রশান্ত মুখার্জি ? তুই সে বাড়ির কথা বলছিস ?

—হ্যাঁ, সেই মুখুজ্যে বাড়ির মেয়ে। ওর নাম কাবেরী।

—বলিস কি রে, পেঁচো ! মুখুজ্যে বাড়ির মেয়ে ঘুরছে একটা বেকার বস্তির ছেলের সঙ্গে ? কলির পাঁচ পোওয়া কি পূর্ণ হয়ে গেল ? ও ছোঁড়াটার এত সাহস। বামন হয়ে চাঁদে হাত। জুতিয়ে ওকে লম্বা করে দিতে হয়।

—বড়বাবু, এখানে ওকে কিছু বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না।

—কেন ওকে জুতোবো না ? সমাজ বলে কি কিছু নেই ?

কিছু করতে গেলে ভিড় জমে যাবে। মেয়েটা যদি চ্যাঁচামেচি করে, লোকেরা ক্ষেপে যাবে আমাদের ওপরেই !

—তা হলে ওর বাপকে আমি বলবো। অনিলবাবুকে সব জানিয়ে দোবো। এটা আমার কর্তব্য।

শিবনাথ রাগে ফুঁসতে লাগলেন। ছেলেটা-মেয়েটা এখনো বেশি দূরে যায় নি। বৃষ্টি নামলো ঝিরঝির করে।

মেয়েটি একটা লাল রঙের ছাতা খুললো। খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে ওরা। বৃষ্টির জন্য কোনো ব্যস্ততা নেই। যেন ওরা একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে রয়েছে !

প্রেসে ফেরার পথে জ্যামে পড়ে গেলেন শিবনাথরা। বৃষ্টি এখন তুমুল, জল জমে গেল রাস্তায়। খারাপ মেজাজ আরও খিঁচড়ে গেল শিবনাথের।

ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

বছরের প্রথম বাদলার জন্য অনেকেই বাড়িতে পালিয়েছে। দুটো মেশিন চলছে শুধু, কাল সকালেই আর্জেন্ট ডেলিভারি দেবার কথা আছে একটা কাজের। শিবনাথ মেশিন ঘরে গিয়ে কাজ তদারকি করলেন। ছাপা ফর্মা তুলে দেখলেন, কালি সমান সমান আসছে কি না, হেডিং-এর একটা ভাঙা টাইপ বদলাবার নির্দেশ দিলেন মেশিন থামিয়ে।

দফতরিখানায় উঁকি দিয়ে দেখলেন ফর্মা ভাঁজ করে চলেছে একজন।

অফিস ঘরে এসে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তারপর যেন একটা গোপন, গর্হিত কাজ করছেন, এই ভঙ্গিতে খুললেন স্টিলের আলমারিটা। বারবার তাকাচ্ছেন জানালার দিকে।

জানালাটাও বন্ধ করা দরকার।

আলমারি থেকে বার করলেন ইন্দ্রজিতের থলিটা। সেটা শুধু ছেঁড়াই নয়, কেমন একটা তেলচিটে গন্ধ।

টেবিলের ওপর থলেটাকে উল্টো করে ভেতরের সব জিনিস বার করে ফেললেন। অপরের জিনিস ঘাটাঘাঁটি করছেন বলে তাঁর একটু একটু অপরাধ বোধ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কৌতূহলও চাপতে পারছেন না।

কয়েকটা নাম না জানা পত্রিকা, একটা মলাট ছেঁড়া কবিতার বই জীবনানন্দ দাশের, সিগারেটের প্যাকেটে একটা মোটে সিগারেট, দেশলাই ডট পেন, আর কতকগুলো খুচরো কাগজে কী সব হিজিবিজি লেখা। কবিতা নাকি ? কেনোটাই দু'তিন লাইনের বেশি পড়তে পারলেন না শিবনাথ। কবিতা তাঁর সহ্য হয় না। মাথা মুণ্ডু কিছুই বোঝেন না।

এই জিনিসগুলোর দাম কানাকড়িও না।

ছেলেটা বলেছিল, একটা চিঠি আছে! দরকারি চিঠি। কাগজগুলো অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেও শিবনাথ কোনো চিঠি খুঁজে পেলেন না। কোনো খাম নেই।

কবিতা লেখা কাগজগুলোই আবার উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়লো, এক জায়গায় লেখা, কাবেরী।

তার তলার লাইনগুলোও কবিতার মতন ভাঙা। এটাই তবে সেই চিঠি ?

শিবনাথ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অল্প বয়েসী ছেলে-মেয়েদের প্রেমপত্র, তাঁর পড়া উচিত নয়। তবু তিনি খানিকটা রোমাঞ্চ বোধ করছেন। কী লেখে ওরা ?

তিনি আবার চোরের মতন ভঙ্গিতে চিঠিটা পড়ার চেষ্টা করলেন। 'তুমি এত সুদূর, আমি তোমার কাছে পৌঁছোতে পারি না, কিন্তু

তুমি তোমার বুকের চারপাশে একজন ব্যর্থ, অতৃপ্ত মানুষের উষ্ণ নিঃশ্বাস টের পাও না ?'

শিবনাথ চোখ বুজে ফেললেন। কাবেরী তাঁর মেয়ের বয়েসী তার চিঠি তিনি এভাবে পড়তে পারেন না।

কাগজটা তিনি ভাঁজ করে ফেললেন।

'তোমার কাছে পৌঁছোতে পারি না।' এই রাস্তা দিয়েই উকিল-বাবুর বাড়ির দিকে যেতে হয়। প্রেসের ধার শোধ করতে পারেনি বলে ইন্দ্রজিৎ এ পথ দিয়ে হাঁটতে সাহস করতো না। একদিন ভরসা করে এসেছিল, কিন্তু সেদিনই ঠিক শিবনাথের চোখে পড়ে গেছে।

না, না, এ ব্যাপারটার প্রশ্রয় দেওয়া যায় না কিছুতেই। চাল-চুলো নেই ছোঁড়াটার, রোজগার নেই, রোজগারের চেষ্টাও নেই। ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়, সে অমন ভালো একটা মেয়ের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। উকিল-বাবু বোধহয় কিছু জানেনই না, এখনো। তাঁর যে কতবড় সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, তিনি টেরও পাননি। মুখুজ্যে বাড়ির মেয়েকে নষ্ট করছে এক বৈদ্যর ছেলে।

এর একটা বিহিত করতেই হবে।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী হঠাৎ দেহরক্ষা করলেন, তারপর দেশটার প্রধানমন্ত্রী হলো কিনা জওহরলালের মেয়ে ইন্দিরা। সারা দেশে আর পুরুষ খুঁজে পাওয়া গেল না ? এতবড় দেশ চালাবে ঐ একটা রোগা মেয়েছেলে ?

ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবার পর যেন সব মেয়েদেরই নতুন করে হাত-পা গজিয়েছে। সবাই ভাবছে এখন মেয়েদেরই রাজত্ব। শিবনাথ লক্ষ করছেন, তাঁর স্ত্রীও যেন ইদানীং চ্যাটাং চ্যাটাং করে কথা বলতে শুরু করেছে। শিবনাথের মুখে মুখে কথা বলতে একটুও ভয় পায় না।

পাঁচকড়ির বউ নাকি একদিন বলেছে, পাঁচকড়ি রাত এগারোটার

পর বাড়ি ফিরলে সে আর ভাত দিতে পারবে না। পাঁচকড়িকে নিজে বেড়ে নিয়ে খেতে হবে। অথচ এই মেয়েটাই কিছুদিন আগেও সাত চড়ে রা কাড়তো না। দেশটা যে একেবারে গোল্লায় যাচ্ছে।

উকিলবাবুর মেয়ে কাবেরীই ঐ বস্তির ছেলেটাকে প্রশ্রয় দেয়নি তো? নইলে সে অমন চিঠি লেখার সাহস পায় কী করে? আবার ভিকটোরিয়ার সামনে হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছিল বৃষ্টির মধ্যে।

শিবনাথের মুখখানা রাগে গনগন করছিল। তার মধ্যেই তিনি মুচকি হেসে আপন মনে বললেন, দাঁড়াও না, দেখাচ্ছি মজা।

॥ ৪ ॥

এক পাড়ারই মেয়ে কাবেরী, তবু শিবনাথ আগে তাকে এতদিন লক্ষ করেননি। নতুন কিছু দেখলে সেদিকে বারবার চোখ পড়ে।

পরদিনই প্রেসে আসবার পথে শিবনাথ দেখলেন, বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছে কাবেরী। হাতে বই-খাতা।

শিবনাথ এদিক ওদিক তাকিয়ে ইন্দ্রজিৎকে খুঁজলেন। ছেলেটাকে আবার এ পাড়ায় দেখলে শিবনাথ তাকে নির্ঘাত পুলিশে ধরাবেন। থানার দারোগার সঙ্গে শিবনাথের যথেষ্ট খাতির আছে। পুজোর আগে শিবনাথের অন্যান্য কর্মচারিদের মতন দারোগাও বোনাস পায়।

না, ইন্দ্রজিৎ কাছাকাছি নেই।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে কলেজ স্ট্রীট মুখো বাসের জন্য। শিবনাথের মনে পড়ে গেল, কলেজ স্ট্রীটে কাগজের দোকান তাঁরও একবার যাওয়া দরকার। টেলিফোন পাওয়া যাচ্ছে না।

শিবনাথের সঙ্গে গাড়ি নেই, তিনি হেঁটে আসছিলেন। তিনিও কাবেরীর সঙ্গে এক বাসে উঠে পড়লেন। কাবেরী যেখানে বসলো, তিনি তার কাছাকাছিই দাঁড়ালেন।

সিটে বসেই কাবেরী একটা বই খুললো। শিবনাথ মেয়েটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। মেয়েটি কারুর সঙ্গে কোনো কথা বলছে না, তবু অনুভব করা যায় যে তার বেশ ব্যক্তিত্ব আছে।

কাবেরী নামলো ইউনিভার্সিটির স্টপে। শিবনাথ জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, সেখানে ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়ে আছে কি না। দেখতে পেলেন না। কাবেরী ভেতরে ঢুকে গেল। ও ক্লাস করতে যাচ্ছে।

শিবনাথ বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কলেজ স্ট্রিট থেকে ফিরেই শিবনাথ পাঁচকড়িকে ডেকে বললেন, উকিলবাবুর বাড়িতে একবার খবর নিয়ে আয় তো, উনি কখন চেম্বারে বসেন। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করবো।

পাঁচকড়ি বললো, আপনি ওনার সঙ্গে দেখা করবেন? সেটা কি ভালো হবে?

—কেন, মন্দটা হবে কিসে?

—ওনার কাছে আপনি কী বলবেন?

—সেটা কি তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে নাকি? তোর বুদ্ধি নিয়ে আমি এত বড় প্রেসটা চালাচ্ছি?

—না, বড়বাবু, আমি বলছি কি উকিলবাবু রাগী লোক। আপনি ওঁর কাছে ওঁর মেয়ের নামে নালিশ করতে গেলে উনি যদি চোটপাট করে ওঠেন? অনেকে বাইরের লোকের কাছ থেকে এই সব কথা শুনতে পছন্দ করে না। বলতে গিয়ে যদি আপনার মান নষ্ট হয়।

—গবেট আর কাকে বলে। উকিলবাবুর কাছে ওঁর মেয়ের কথা তুলবো, একথা তোকে কে বলেছে? উকিলের কাছে লোকে যায় কেন? মামলার কথা বলতে। আমিও তাই বলবো।

—এখন তো কোনো মামলা নেই আমাদের।

ঐ ছোঁড়াটা, ঐ যে পোসেনজিৎ, না ইন্দরজিৎ আমাকে মামলার কথা বলে তড়পে যায়নি? আমি ঐ ছোঁড়াটার নামেই মামলা করবো।

কী বলছেন, বড়বাবু? সাতশো আশি টাকার জন্য আপনি হাই-

কোর্টে মামলা করবেন ? উকিলবাবুর একদিনের ফি-ই তো আসলে কম সে কম হাজার টাকা। উনি উকিল নন, আসলে ব্যারিস্টার।

—কুছ পরোয়া নেই। হাজার টাকা যায় যাক। ঐ ছোঁড়াটাকে টিট করতে হবে, এটাই আসল কতা। আমার যত টাকাই খরচ হোক, ওকে আমি জেল খাটাবো।

—এত কম টাকার মামলা কি হাইকোর্টে নেয় ?

—আলবৎ নেয়।

—না বোধহয়, বড়বাবু। হাইকোর্ট মানে হাই হাই ব্যাপার।

—তা মামলা হোক না হোক, উকিলের কাছে পরামর্শ নিতে তো বাধা নেই। আমি পুরো ফি দোবো। উকিলবাবুকে বলবো, এক ব্যাটা বদ্যির ছেলে আমার সঙ্গে জোচ্চুরি করেছে, কাগজ ছাপিয়ে পয়সা দেয়নি। মিথ্যে কথা বলেচে। লোক ঠাকানোই ওর কাজ, ওর বাপও অপরের জমি জবর দখল করে থাকে, সেই ছেলে আপনার অমন ভালো মেয়ের সঙ্গে হিড়িক দিচ্ছে। এখন আপনি বুঝুন, নিজের ঘর সামলাতে পারবেন কি না।

—এ জন্য আপনি নিজের গ্যাঁটের টাকা খরচ করবেন ?

—বেশ করবো। যা খবর নিয়ে আয়।

পাঁচকড়ি ঘুরে এসে একটা দুঃসংবাদ দিল।

কাবেরীর বাবা উকিলবাবু কিডনির পাথর অপারেশনের জন্য নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছেন আজই। এখন অন্তত দু' সপ্তাহ তিনি কোনো মক্কেল দেখবেন না।

শিবনাথ শিউরে উঠলেন। উকিলবাবু নার্সিং হোমে। মাথার উপর অভিভাবক নেই, মেয়েটা এখন যা ইচ্ছে করে বেড়াতে পারে। এই সুযোগে ঐ ইন্দ্রজিৎ ছোঁড়াটা ওকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালাবে না তো ? হয়তো ছোঁড়াটা ঐ মেয়েটার সব সম্পত্তি হাতাবার তালে আছে।

শিবনাথ ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু ইন্দ্রজিৎকে শাস্তি দেবার তক্ষুনি কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না।

পাঁচকড়িকে বললেন, তক্কে তক্কে থাকবি। ছোঁড়াটাকে এ পাড়ায় দেখলেই সোজা ধরে আনবি আমার কাছে।

তারপর সারাদিন কেটে গেল কাজের ব্যস্ততায়।

টেলিফোন ডিরেকটরির কাজটা পাওয়া গেছে শেষ পর্যন্ত। ছাপা শুরু হয়ে গেছে। বাটা কম্পানির আর একটা বেশ বড় কাজও হাতে এসেছে, এ বছরের ব্যবসা খুব ভালো। অনেক চেষ্টায় প্রেসের একটা সুনাম গড়ে তুলতে হয়েছে, এখন কাজ এমনি এমনি আসে।

রাত্তিরের দিকে শিবনাথের বন্ধু হেমকান্তি এসে উপস্থিত। হেমকান্তি তাঁর নিয়মিত ইয়ার বক্সিদের দলে নেই। খেয়ালি মানুষ, ন' মাসে ছ' মাসে হঠাৎ হঠাৎ এসে উপস্থিত হন। একটু সিনিক ধরনের মানুষ। কারুকে তোশামোদ করা তাঁর ধাতে নেই।

এই দু' জনের মধ্যে চরিত্রের কোনো মিল নেই, তবু শিবনাথ বেশ পছন্দ করেন হেমকান্তিকে। রোগা, পাকানো চেহারা, ধুতির পর সাদা পাঞ্জাবি ছাড়া কিছু পরেন না, সরু গোঁফ।

আড্ডা না দিয়ে আজ শিবনাথের বাড়ি ফেরার ইচ্ছে ছিল, তবু হেমকান্তিকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, আয়, আয়।

হেমকান্তি বললেন, বিকেলে আজ বৃষ্টিতে ভিজেছি। তাই একটু হুইস্কি খাওয়ার ইচ্ছে হলো। কিন্তু ভাঁড়ে মা ভবানী। তাই ভাবলুম, তোর এখানে এলে বিনি পয়সায় খাওয়া যেতে পারে।

শিবনাথ বললেন, ও শুধু এই জন্যই তুই আমার এখেনে এলি।

হেমকান্তি বললেন, তা ছাড়া আর তোর চাঁদ বদন দেখতে আসার কী কারণ থাকবে বল? আজ যে দেখছি লোকজনের ভিড় নেই?

—সবাইকে কাটিয়ে দিইচি।

—বেশ করেছিস। ভালোই হলো। তা হলে প্রাণ খুলে দুটো কথা বলা যাবে। তোর এখেনে আসবার আরও একটা কারণ আছে। একটা কৌতূহল মেটাতে চাই। কই, মাল কোথায়?

ও জিনিস শিবনাথের কাছে সব সময় মজুত থাকে। তিনি পাঁচ-

কড়িকে গেলাস আর সোডা দিতে বললেন, তারপর বন্ধ করে দিলেন দরজা।

প্রথম চুমুক দেবার পর হেমকান্তি বললেন, হ্যাঁরে, শিবু, তুই নাকি কী সামান্য টাকা দিতে পারেনি বলে একটা ছেলের ঝোলা ব্যাগ কেড়ে নিয়েছিস ?

শিবনাথ উত্তেজিত হয়ে বললেন, কে বললে তোকে ?

—হাওয়ায় কথা ভাসে। এসব খবর চাপা থাকে না। টাকার জন্য তুই এত চশমখোর হয়ে উঠেছিস নাকি ?

—তবু কে তোকে খবরটা দিয়েছে বল।

—আমি কলেজ স্ট্রীট কফি হাউজে মাঝে মাঝে কফি খেতে যাই। ওরা কফিটা বড় ভালো বানায়। ওখানে তো যত রাজ্যের ছেলে ছোকরার আড্ডা। পাশের টেবিলের কয়েকটি ছেলে বলাবলি করছিল। তোর প্রেসের নামটা বললো। সত্যি নিয়েছিস তা হলে ?

—হ্যাঁ নিইচি। বেশ করিচি। টাকা মেরে দিলে ছাড়বো কেন ?

—তা বলে জোর করে ব্যাগ কেড়ে নিবি ? ছেলেগুলো খুব ক্ষেপে আছে তোর ওপর। কলেজ স্ট্রীটের দিকে একা একা যাসনি যেন। বাগে পেলে তোকে পেঁদিয়ে দেবে। ছাত্রদের ভয়ে এখন প্রফুল্ল সেনও কাঁপে।

—আমাকে মারবে ? তেমন বাপের ব্যাটা আজও জন্মায়নি। এই ছাখ আমার হাতের মাসল। এককালে আমিও কম মাস্তান ছিলুম না। এখনো বুড়ো হয়ে যাইনি। শিবনাথ ধরকে কে মারবে দেখি। কালই আমি কলেজ স্ট্রীট গিয়ে একা একা ঘুরবো।

—আরে অত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন ? অল্পবয়েসী ছেলে, ঝোঁকের মাথায় একটা পত্রিকা ছাপিয়েচে, তোকে টাকা দিতে পারেনি। সব ব্যবসাতেই দু' পাঁচ শো টাকা গচ্চা যায় মাঝে মাঝে। কিছু কিছু পুরোনো ধার রাইট অফ করে দিতে হয়। কী তোর প্রেসে এরকম টাকা কিছু কিছু মার যায় না ? তা বলে কি ছোট ছোট ছেলেদের ওপর

অত রাগ করতে আছে ?

—ছোট ছোট ছেলে বলেই ওদের আমি ছাড়বো না। বুড়ো ধাড়ি কেউ এরকম করলে আমি ছেড়ে দিতুম। ঐ সামান্য কটা টাকা আমার হাতের ময়লা।

—এ কী অদ্ভুত কথা বলছিস রে, শিবু। বুড়ো ধাড়িদের তুই ছেড়ে দিবি আর কচি কচি ছেলেদের কড়কাবি।

—ছোকরাদের তোরা লাই দিস বলেই তো বাঙালী জাতটা উচ্ছন্নে গেল।

—হা-হা-হা-হা-হা ! ছোকরাদের গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করে তুই বাঙ্গালী জাতটার উন্নতি করতে চাস ?

—ঐ ছোকরার বয়েস কত জানিস ? বাইস-তেইশ হবে। এক সময় তোর-আমার ঐ বয়েস ছিল না ? তুই-আমি কারুর টাকা মেরে দিইচি কখনো ?

—তা দিইনি বটে। কিন্তু আমরা সেজন্য বাঙালী জাতির কিছু উন্নতি করতে পেরেছি বলে তো মনে হয় না।

—হিমু, তুই কিছু পারিস না পারিস, আমি পেরিচি। এত বড় প্রেস চালাই, তাতে সাতষট্টি জন লোকের চাকরি হয়েচে। এতগুলো ফ্যামিলি আমার জন্য খেয়ে পরে বাঁচচে। এই প্রেস কি আমার বাপের সম্পত্তি ছিল ? আমার নিজের হাতে গড়া।

—হ্যাঁ, তুই বেশ সাকসেসফুল হয়েচিস বটে। ব্যবসায়ে বাঙালীর উদ্যম, এই নিয়ে আর্টিকেল লেখা যায় তোকে নিয়ে। তুই যাকে বলে সেলফমেড ম্যান। তা বলে কি তোর একটু দয়া-মায়া থাকবে না ?

—আমার ক্যাপিটাল ছিল সাত টাকা।

—সে কি রে ? সাত টাকা দিয়ে এত বড় প্রেস বানালি কী করে ?

—বেশিদূর লেখা পড়া শিখিনি। ইংলিশ জানি না। বাইশ-তেইশ বছর বয়েসে বাপের হোটেলে খেতুম আর পাড়ায় মাস্তানি করে বেড়াতুম। রোজগারের কোনো ধান্দা ছিল না। চাকরি বাকরি তো

করবোই না ঠিক করেছিলুম। একদিন আমার বাবা আমাকে ভাত খাওয়া নিয়ে খোঁচা দিলেন। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মাকে বললেন, ছেলেটা দিন দিন খোদার খাসী হচ্ছে। সংসারে এক পয়সা দেয় না, দু' বেলা এক সের চালের ভাত গেলে। তার ওপর পোশাকের বাহার আছে। ব্যাস, সেই কথা শুনে রক্ত গরম হয়ে গেল। প্রতিজ্ঞা করলুম, রোজগার না করলে জীবনে আর এ বাড়ির ভাত খাবো না। এ বাড়ির ছায়াও মাড়াবো না। ব্যাস, সেই মোমেন্টেই বাড়ি থেকে হাওয়া।

—তুই কি এখন অটোবায়োগ্রাফি শোনাবি নাকি রে, শিবু। সাধারণত এগুলো খুব বোরিং হয়। আমরা তো জানিই তুই নিজে একা এত সব কিছু করিচিস।

—চোপ শালা। আমার পয়সায় মাল খাবি, আর আমার দুটো কথা শুনবি না ?

—না, না, বল বল। রাগালে তোর নাকটা ফুলে যায়, তাতে তোর মুখখানার তবু একটু ছিরি খোলে। বাড়ি থেকে যখন ভাগলি, তখন তোর পকেটে মোট সাত টাকা ?

—যাস্ট সাতটা মোটে টাকা। রাতটা কাটালুম শেয়ালদা এস্টেশানে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, এর পর কী করে চলবে ? তখন পাইস হোটেলে ছ' আনায় পেট চুক্তি ভাত খাওয়া যায়, কিন্তু তাতেও তো সাত টাকা নিয়ে বেশিদিন খাওয়া জোগানো যাবে না। পরদিন কী করলুম জানিস ? শেয়ালদার কাছেই একটা ধূপকাঠির কারখানা, সেখানে গিয়ে পুরো সাত টাকারই ধূপ কাঠির প্যাকেট কিনে ফেললুম। সারাদিন উপোস। ট্রেনে ধূপকাঠি ফিরি করে দিনের শেষে হিসেব করে দেখলুম, পাঁচ সিকে লাভ হয়েছে। তখন হোটেলে ভাত খেতে গেলুম। নিজের ব্যবসার লাভের টাকায় খেয়িচি প্রথম দিন থেকেই। মূলধন ভাঙিনি।

—তুই ট্রেনে ধূপকাঠি ফিরি করতিস ? এটা জানতুম না তো রে।

—আমার বাবা মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করতেন। কলকাতায় আমাদের নিজেদের বসত বাড়ি ছিল। ছোটলোক নই। আমিও ভদ্দরলোকের ছেলে। কিন্তু ধূপকাঠির ফিরিওয়ালা সাজতে তো আমার লজ্জা হয়নি। দশ মাসের মধ্যে আমি বেলেঘাটায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে নিজে ধূপ বানাতে শুরু করলুম।

—তোর বাপ-মা খোঁজ করেননি ?

—আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই শেয়ালদা স্টেশানে আমাকে খুঁজে বার করেছিল, কিন্তু তবু আমি বাড়িতে আসিনি। ছ' মাস পরে মায়ের সঙ্গে দেখা করে শাড়ি দিয়ে এসিচি।

—নিজে ধূপ বানাতিস ?

—হ্যাঁ। সেই ধূপের প্যাকেটের লেবেল ছাপাতে গেসলুম একটা প্রেসে। প্রেসের মালিকের সঙ্গে আলাপ হলো। দু' চারবার যাতায়াত করার পর মনে হলো, প্রেসের ব্যাবসাটাও মন্দ নয়। ছুটোছুটি করতে হয় না। দু' বছরের মাথায় ধূপের কারবার ছেড়ে একটা ট্রেডল মেশিন কিনলুম সেকেণ্ড হ্যাণ্ড। নিজেই চালাতুম, বেলেঘাটার ঐ ঘরে। বিড়ির বাণ্ডিলের লেবেল ছাপতুম।

—সেই ট্রেডল মেশিনের প্রেস থেকে এতবড় প্রেস !

—এখন আমার চারখানা জার্মান ফ্ল্যাট বেড মেশিন। লাইনো অফসেট। পেপার কাটিং-এর যন্তরটা দেখিচিস কত বড় ? সব এই একা হাতে গড়া।

—ব্রাভো। জিতা রহো শিবনাথ। তুই যে বাঙালীর গর্ব।

—ঐ বাইশ-তেইশ বছরের ছোঁড়াটার পকেটে সাত টাকা থাকে না ? ওর অপমান বোধ নেই ?

—তুই চাস ঐ ছেলেটাও ট্রেনে ট্রেনে ধূপ বেচা শুরু করুক ? ট্রেনে উঠলেই আজকাল বড় বেশি ধূপওয়ালা ওঠে। কান ঝালাপালা করে দেয়। ও লাইনে আজকাল খুব কমপিটিশন রে, শিবু।

—চিনে বাদাম বেচতে পারে। কোনো বাদামওয়ালার কখনো লস

যায় না।

হেমকান্তি ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসি আর থামতেই চায় না। শিবনাথ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন খানিকটা। গেলাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনে বললেন, এতে হাসির কী হলো? অ্যাঁ? এটা কি হাসির গপ্পো? এত বড় প্রেসটা করিচি, সেটা হাসির ব্যাপার?

হেমকান্তি ঠোঁট মুছে বললেন, ছেলেবেলায় শুনেছিলুম, আলামোহন দাস মুড়ি বিক্রি করতেন। তারপর সেই তিনিই কারখানা টারখানা খুলে বিরাট শিল্পপতি হয়ে গেলেন। তাঁর নামে একটা জায়গার নাম হয়েছে দাসনগর। তাই না? কিন্তু সবাই কি তাই হয়? কত মুড়িওয়ালা সারা জীবন মুড়িই বিক্রী করে যায়। ট্রেনে যারা ধূপ বিক্রি কচ্ছে, তারা ধূপ বিক্রি করতে করতেই বুড়ো হয়ে যায়, তোর মতন ক'জন আর অন্য ব্যবসায় যায়?

—তাতেও বোধহয় না রে।

দ্যাখ না, ঐ ইন্দরজিৎ ছোঁড়াটাকে আমি কী করি। ঠেলতে ঠেলতে এমন জায়গায় নিয়ে যাবো যে তারপর আর কোনো উপায় থাকবে না। রোজগার করতে নামতেই হবে। বেশ চকচকে কথা বলে, তার মানে বুদ্ধির অভাব নেই। বুদ্ধি থাকলে পারবে না কেন? ঠিক পারবে। একবার লেগে পড়ুক, তারপর আপনি আপনি এগিয়ে যাবে।

—ও ছেলেটা তো পদ্য লেখে। ওরে শিবু, তুই ভুল ঘোড়া ব্যাক করছিস। আলামোহন দাস কিংবা তুই যেমন ব্যতিক্রম, তেমনি যারা পদ্য লেখে, তারাও ব্যতিক্রম। ওদের পত্রিকা ছাপানোর টাকা তুই আর কখনো পাবি না। আশা ছেড়ে দে।

—যারা পদ্য লেখে, তারা বুঝি অপরের টাকা মেরে বেড়ায়? গুঁতো খেলেই ওসব ভূত মাথা থেকে নেমে যাবে।

—গুঁতো খেলে যদি তার মাথা থেকে পদ্য লেখার ভূত নেমে যায়, তা হলে বুঝতে হবে, সে ব্যতিক্রম নয়। ভুষিমাল।

—কী বললি ? ঠিক বুঝলুম না তো।

—তুই এসব বুঝবিও না। মনে কর, রবি ঠাকুর, তিনি কত বড় কবি ছিলেন জানিস তো ?

—তুই আমাকে কী ভাবিস রে, হেমু ? আমি মুখ্যু বটে, তা বলে কি এত মুখ্যু যে গুরুদেবের কথা জানবো না ?

—মনে কর, রবিঠাকুরের যখন একুশ-বাইশ বছর বয়েস, বেশি দূর লেখা পড়া করেননি, ইস্কুল পালানো ছেলে, কাজ-কর্ম বিশেষ কিছু করেন না, গা ফুঁ দিয়ে বেড়ান, সেই সময় তার বাবা দেবেন ঠাকুর একদিন তাঁকে ভাতের খোঁটা দিলেন। রোজগার করো না, খেতেও পাবে না, দূর হয়ে যাও। রবি ঠাকুর কি তা হলে তোর মতন ট্রেনে ধূপ বিক্রি করতো ? কিংবা, ধূপের ব্যবসায় নামলেও তোর মতন লাখোপতি হতে পারতো ?

—ছি ছি ছি ছি, গুরুদেবের নামে এমন কথা বলতে নেই।

—কথার কথা বলছি। ঘরের মধ্যে বসে বলছি, কেউ তো শুনছে না। গুরুদেব ধূপ বেচে সাকসেসফুল হতে পারতেন ?

—তা হলে আমিও বলচি, আলবাৎ পারতেন। গুরুদেবের অত বুদ্ধি, উনি ধূপ বেচেই কোটিপতি হতেন।

না রে, তা হলে এত ভালো ভালো পদ্য আর গানগুলো কে লিখতো ? গুরুদেব ধূপের ব্যবসায় নামলেও খড়দা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা বড় গাছের ছায়ায় বসে থাকতেন, দু'পাশে ছড়ানো থাকতো ধূপের প্যাকেট, উনি কবিতাই লিখে যেতেন এক মনে। যারা ব্যতিক্রম হয়, তারা এরকমই হয়।

—আমি তোর কথা মানি না। আমি ঐ ইন্দ্রজিৎকে বাড়ি-ছাড়া করাবো। টাকার তাগাদা দিয়ে দিয়ে ভয় দেখিয়ে কোন্ ঠাসা করবো, ও একটা কিছু রোজগারের পথে নামতে বাধ্য হবে। বাঙালীর ছেলেকে আমি দাঁড় করাবোই। একবার লেগে পড়লে ও ছেলে ঠিকই পারবে।

হেমকান্তি আবার হাসতে শুরু করলেন গলা চড়িয়ে।

তারপর বললেন, তোর যত পাগলামি, শিবু। বাঙালী উদ্ধারের দায়িত্ব তোকে কে দিয়েছে? সাত কোটি সন্তানের হে মোর জননী, রেখেচে বাঙালী করে মানুষ করোনি। ও ছেলেটার আর ধরা-ছোঁয়া পাবি না তুই কোনোদিন। সাত শো আশি টাকার শোক আর বেশি-দিন পুশে রাখিসনি।

হেমকান্তি চলে গেলেন একটু পরে। তিনি তিন পেগের বেশি খান না। বিনা পয়সায় পেলেই যে পেট ভরে খেতে হবে, তা তিনি বিশ্বাস করেন না।

শিবনাথ আরও বসে রইলেন কিছুক্ষণ। একবার শুরু করলে তাঁর নেশা চড়া চাই, না হলে ঘুম হবে না রাত্তিরে। পাঁচকড়িকে ছুটি দিয়ে তিনি বসে রইলেন একা।

প্রসেনজিৎ ওরফে ইন্দ্রজিতের কথাই তিনি ভাবতে লাগলেন। ঐ চিন্তাটা মন থেকে যাচ্ছে না কিছুতেই। এক একবার তিনি ইন্দ্রজিতের চেহারায় দেখতে পাচ্ছেন তাঁর নিজের মুখ। তাঁর বাইশ বছর বয়েসের মুখ। প্রথম ছ' মাস ট্রেনে ফিরি করার সময় তাঁর এক বেলার বেশি খাওয়া জুটতো না। তবু সারা দিনের শেষে বিক্রিবাটার হিসেবে মিলিয়ে দেখা যেত কিছু লাভ হয়েছে তার যে কী আনন্দ, তা তিনি আজও ভুলতে পারেন না। নিজের পরিশ্রমের উপার্জন, তা এক অদ্ভুত তৃপ্তি এনে দেয়। একালের বেকার ছেলেরা সেটা বোঝে না কেন? বাঙালী জাতটার এই অবস্থা........

ঐ ইন্দ্রজিৎকে তিনি বুঝিয়ে ছাড়বেন।

ওর বাবাকে বোড়ালের জমি থেকে উচ্ছেদ করা গেল কি না, তার খোঁজ নিতে হবে এই সপ্তাহেই। সব রকম বিপদে ফেলতে হবে ওকে। তাতে যদি হুঁশ হয়।

কিন্তু আর একটাও দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন শিবনাথ। ভিকটোরিয়ার বাগানের পাশ দিয়ে ঐ ছোঁড়াটা হেঁটে যাচ্ছে কাবেরীর পাশে পাশে, মাথার ওপর লাল ছাতা।

বাইশ বছরের শিবনাথের জীবনে কাবেরীর মতন কোনো নারী তো ছিল না। তেমন কেউ থাকলে কি-তিনি ট্রেনে ধূপ বিক্রি করতে যেতেন ?

ঐ কাবেরীই চুম্বকের মতন টেনে রেখেছে ইন্দ্রজিৎকে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে তাল রাখার জন্য ইন্দ্রজিৎ একে-তাকে ঠকাবে, বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করবে, তবু কোনো ছোট কাজ করতে রাজি হবে না। বাদাম বিক্রি দূরে থাক, বই বিক্রিও করবে না ফুটপাথে বসে। ঐ মেয়েটাই ওর উন্নতির অন্তরায়।

মেয়েটাকে সরাতেই হবে ইন্দ্রজিতের পাশ থেকে। যদি হিম্মৎ থাকে, ইন্দ্রজিৎ এখন সরে যাক, কোনো ব্যবসায় নামুক, দু' তিন বছরের মধ্যে উন্নতি করুক, তারপর একদিন নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে এসে দাঁড়াক উকিলবাবুর বাড়ির দরজার সামনে। অনেক টাকার মালিক হলে কেউ জিজ্ঞেস্ করবে না, তুমি বদ্যি না শুদ্দুর। এখনকার সমাজে যার টাকা আছে, ক্ষমতা আছে, সে-ই বামুন।

কী করে সরানো যায় ছেলেটাকে। উকিলবাবু নার্সিংহোমে, পনেরো দিনের মধ্যে ফিরবেন না। এর মধ্যে যদি কিছু একটা ঘটে যায় ? মেয়েটা একবার কেলেংকারি করে ফেললে আর কিছুই করা সম্ভব হবে না। ছেলেটা বোধহয় ঘর জামাই হয়ে থেকে যাবে। আবার বাঙালীর অধঃপতন।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা উপায় মাথায় এলো শিবনাথের।

উকিলবাবু বাড়িতে নেই, তাঁর স্ত্রী তো আছেন। মা হয়ে বেশি অ্যাকশান নেবেন। মায়েদেরই বেশি ভয় থাকে মেয়েদের সম্পর্কে। উকিলবাবুর স্ত্রীকেই সব কথা জানানো দরকার। কাবেরীর মায়ের সঙ্গে দেখা করা যাবে কোন্ ছুতোয় ? চিঠি লিখে জানানো যায় অবশ্য। বেনামী চিঠি।

শিবনাথ তক্ষুনি একটা প্যাড টেনে নিয়ে কাঁপা অক্ষরে লিখতে

শুরু করলেন।

মাননীয় মহাশয়া,

আপনার কন্যা কাবেরী ইদানীং একটি দুশ্চরিত্র ছেলের সহিত মিশিতেছে। তাহার নাম ইন্দ্রজিৎ দাসগুপ্ত। আপনি জানেন কিনা জানি না, সে ছেলেটি একটি জুয়াচোর। লোক ঠকানোই তার কাজ। আপনার মেয়ের সর্বনাশ করিবে। এখন সময় থাকতে মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করুন ভালো ঘরে, ঐ ইন্দ্রজিৎকে একেবারেই মিশিতে দিবেন না……

লিখতে লিখতে আনন্দে শরীর দোলাতে লাগলেন শিবনাথ। প্রেমিকার কাছে আপনার, সবচেয়ে বড় অপমান। উকিলবাবুর বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেও ওর পৌরুষ জ্বলে উঠবে না? তখন ও প্রতিজ্ঞা করবে না, এবার নিজের পায়ে দাঁড়াবো তারপর ফিরে আসবো!

চিঠিখানা ভাঁজ করে খামে ভরে শিবনাথ এমনভাবে সেটা তুলে ধরলেন নিজের চোখের সামনে, যেন মনে হলো ওটাই ইন্দ্রজিতের মারণাস্ত্র।

॥ ৫ ॥

যাওয়া আসার পথে প্রত্যেকবার শিবনাথ তাকিয়ে দেখেন উকিল-বাবুর বাড়ির দিকে।

সদর দরজা বন্ধ, দোতলার জানলা বন্ধ। কাবেরীকে দেখতে পান না একবারও। বাড়িটার চেহারা কেমন যেন থমথমে। উকিলবাবু অবশ্য ভালো আছেন, তিনি খবর নিয়েছেন, অপারেশন হয়ে গেছে ঠিকঠাক।

তবু বাড়িটা কেমন যেন বন্ধ দুর্গের মতন দেখায়। চিঠিতে কাজ হয়েছে। কাবেরীকে আটকে রেখেছে। ইন্দ্রজিৎকে কী বলে দেওয়া হয়েছে, কে জানে। পাঁচকড়ি সতর্ক নজর রাখে, কিন্তু সে ছেলেটিকে এ তল্লাটে আর দেখা যায়নি একবারও।

বোড়াল থেকে খবর এসেছে, ইন্দ্রজিতের বাবা সামনের মাসেই জমি ছেড়ে দেবার কথা দিয়েছে। শিবনাথ সত্যি সত্যি একটা গরু কিনে পাঠিয়েছিলেন, তাতেই কাজ হয়েছে অনেকটা। জমি ছেড়ে ইন্দ্রজিৎরা কোথায় গিয়ে ওঠে, সে সন্ধানটাও রাখতে হবে। ছেলেটা যদি কোনো কাজ শুরু করে, শিবনাথ দূর থেকে নজর রাখবেন তার ওপর।

ছেঁড়া থলেটা রয়েই গেল, সেটা আর নিতেও এলো না ছেলেটা। ভেতরের কাগজপত্র সব ফালতু। চিঠিখানারও এখন আর কোনো প্রয়োজন নেই। সবসুদ্ধু এখন ফেলে দিলেই হয়।

দু'দিন খুব ব্যস্ত রইলেন শিবনাথ। দুটো মেশিন হঠাৎ বসে গেছে। কাগজের দাম বেড়ে গেল আচমকা। অথচ পার্টিকে ঠিক সময় ডেলিভারি দিতে না পারলে প্রেসের বদনাম।

বিকেলের দিকে বৃষ্টি নামলো ঝমঝমিয়ে। আকাশের অবস্থা খারাপ। বেশিক্ষণ বৃষ্টি চললে এ রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়। ছাপা ফর্মা গাড়িতে তুললেও অসুবিধে হবে।

অফিসে ঘরে আর কেউ নেই, শিবনাথ একা বসে একটা নতুন অর্ডারের কোটেশান তৈরি করেছিলেন, হঠাৎ পাঁচকড়ি দরজা ঠেলে ভয়ার্ত মুখ বাড়িয়ে বললো, এই রে সেরেছে, বড়বাবু, আপনার সঙ্গে উকিলবাবুর মেয়ে দেখা করতে চাইছে।

কথাটা শুনে শিবনাথের বুকটা কেঁপে উঠলো। বেনামী চিঠিটা কে লিখেছে, তা জেনে ফেলেছে নাকি? কিন্তু তিনি তো অফিসের প্যাড ব্যবহার করেননি। তাঁর হাতের লেখা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

চিঠিটার কথা তিনি পাঁচকড়িকেও বলেননি।

শিবনাথ বললেন, দেখা করতে এসেছে তো দাঁড় করিয়ে রেখেছিস

কেন, নিয়ে আয়।

শিবনাথ একটা সিগারেট ধরালেন। এই টেবিলে বসে তিনি কত বড় বড় কম্পানির অফিসারদের ঘায়েল করেছেন, আর একটা পুঁচকে মেয়েকে ধমকে দিতে পারবেন না ? কিন্তু তাঁর হাত একটু কাঁপছে।

লাল ছাতাটা সঙ্গে আনলেও কাবেরী আজ ভিজে গেছে অনেকটা। তার মুখে লেগেছে বৃষ্টির ঝাপটা, তার শাড়ির জায়গায় জল ছাপ। তার চোখ অল্প বয়েসের সারল্যের আগুন।

কাবেরী ঢুকেই জিজ্ঞেস করলো, আপনি এই প্রেসের মালিক শিবনাথ ধর।

—হ্যাঁ, নমস্কার। বসুন।

—আমি বসতে আসিনি। আমি জানতে এসেছি, আপনি ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত নামের একজনের ঝোলা ব্যাগ কেড়ে রেখেছেন ?

—কী ব্যাগ বললেন ?

—একটা কাপড়ের তৈরি কাঁধে ঝোলাবার ব্যাগ। তাতে অনেক দরকারি জিনিস ছিল।

—ও হ্যাঁ, একটা ব্যাগ। কেড়ে তো রাখিনি। জমা রেখিচি। সে তো অনেকদিনের কথা। যার ব্যাগ, সে নিতে এলো না। ফেলে দিয়িচি কিনা কে জানে। ছেঁড়া-খোঁড়া, ময়লা একটা থলে।

—ফেলে দিয়েছেন ? কী বললেন আপনি ? তার মধ্যে এমন সব কাগজপত্র আছে···অন্যের জিনিস আপনি ফেলে দেবেন ?

খুঁজলে হয়তো পাবো। কিন্তু আপনি হঠাৎ সেটার খোঁজ নিতে এসেছেন এতদিন বাদে···যদি দামি জিনিস থাকে, আগে আসেননি কেন ?

—তার কারণ, এতদিন আমি সে কথাটা জানতে পারিনি। যার ব্যাগ, সে আমাকে বলেনি। সে লাজুক, ভীতু। আমার কাছে গোপন করে গেছে। আজ চতুরঙ্গ পত্রিকা অফিসে হঠাৎ শুনলাম··· আপনি একজনের ব্যাগ কেড়ে নিতে পারলেন ? ছি ছি ছি !

শিবনাথের হাতের কাঁপুনিটা কমে গেছে। তিনি এখন মুচকি মুচকি হাসতে পারছেন। মেয়েটি বেনামা চিঠির কথা উল্লেখ করেনি।

তিনি বললেন, কেড়ে রাখিনি, জমা রেখিচি। যার ব্যাগ সে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেই পারে। আমি কি কখনো সেটা দেবো না বলিচি।

কাবেরী মুখ কুঁচকে বললো, সামান্য কটা টাকা পাওনা আছে বলে আপনি একজনের কাঁধ থেকে ব্যাগ খুলে রাখবেন? জানেন, এটা বে-আইনী? ব্যাগের মধ্যে কত ভ্যালুয়েবল জিনিস থাকতে পারে··· এক একটা জিনিসের ভ্যালু এক একজনের কাছে এক এক রকম।

উকিলের মেয়ে, তাই আইন দেখাচ্ছ। এ রকম আইন শিবনাথও কম জানেন না। তিনি মিষ্টি মিষ্টি করে বললেন, যার ব্যাগ তার কোনো পাত্তা নেই, আপনি এসে আমাকে কথা শোনাচ্ছেন, এটাই বা কী রকম আইন? আপনি কে তা তো বুঝলুম না কো।

কাবেরী বললো, ওটা আমার এক বন্ধুর ব্যাগ।

—সে আপনাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়েছে।

—কী কথা বলছেন। এর জন্য আবার পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি লাগে নাকি? আপনার কিছু টাকা পাওনা আছে তো? এখন ব্যাঙ্ক বন্ধ, ক্যাশ দিতে পারছি না। আমার এই আংটিটা, এতে মুক্তো বসানো আছে, এটার দাম হাজার টাকার কম হবে না। এটা রেখে যদি!

কাবেরী ছটফট করে তার বাঁ হাতের অনামিকা থেকে আংটিটা খুলতে লাগলো। শিবনাথ একদৃষ্টে সে দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটা টানেনি, ছেলেটাই জাদু করেছে এই মেয়েটাকে। কতকগুলো বাজে কাগজ আর একটা ছেঁড়া থলের জন্য মুক্তোর আংটি খুলে দিচ্ছে।

কাবেরী আংটিটা টেবিলের ওপর রাখতে যেতেই শিবনাথ বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, এটা বন্ধকী কারবারের দোকান নয়, এটা প্রেস। এখানে আমরা ঘড়ি আংটি নিই না।

—ব্যাগটা আমার এক্ষুনি চাই।

—আপনি টাকা দিলেও থলেটা দিতুম না আপনাকে। আপনিই বললেন, তার মধ্যে অনেক ভ্যালুয়েবল জিনিস আছে। অন্যের জিনিস আপনাকে দোবো কেন?

—সে সব জিনিসের কোনো দাম নেই আপনার কাছে। আমার কাছে আছে। আপনি ব্যাগটা খুলে দেখতে পারেন। আংটিটা নিতে আপনার আপত্তি কী আছে। এক্ষুনি কোনো স্যাকরার দোকানে পাঠালে সেটা বিক্রি হয়ে যাবে।

—আহা কী কথাই বললেন। আপনি আংটিটা রেখে যাবেন, পরের মুহূর্তেই পুলিশ এসে বলবে, আমি চোরাই মাল রেখিচি।

কাবেরী তবু আংটিটা ছুঁড়ে মারলো শিবনাথের গায়ে।

শিবনাথ সেটা লুফে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, মুক্তো ছুটো ঝুটো নয়, সাচ্চা। হাজার খানেকের বেশিই দাম হবে। মেয়েটা তাকে টাকার গরম দেখাচ্ছে।

তিনিও আংটিটা ছুঁড়ে ফেরত পাঠালেন। সেটা মেঝেতে পড়লো।

শিবনাথ বললেন, সরি ম্যাডাম, আসল মালিক এসে আমার গণ্ডা বুঝিয়ে না দিলে আমি দোবো না থলে।

কাবেরী অভিমানে ঝাঁঝালো গলায় বললো, আপনি দেবেন না?

শিবনাথ বললেন, না।

ঠিক তক্ষুনি দরজার এক পাল্লা ঠেলে ঢুকলো প্রসেনজিৎ ওরফে ইন্দ্রজিৎ। তার সঙ্গে ছাতা নেই, সর্বাঙ্গ ভেজা। ঝোড়ো কাকের মতন চেহারা।

ভেতরে এসে শিবনাথকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সে কাবেরীকে বললো, এই, তুমি কখন চলে এলে? আমি খুঁজছি তোমাকে। তারপর ঠিক মনে হলো, তুমি এখানেই আসবে। ছুটতে ছুটতে আসছি।

কাবেরী বললো, তুমি একথাটা আমাকে আগে বলোনি কেন?

ইন্দ্রজিৎ বললো, আরে যাঃ, এটা কি বলবার মতন কিছু ব্যাপার। আমি চতুরঙ্গ অফিসে রহমান সাহেবকে শুধু চুপি চুপি একদিন জানিয়েছিলুম। উনি যে আবার তোমার কাছে ফাঁস করে দেবেন ··এত খারাপ লাগছে আমার।

—সামান্য এই কটা টাকা বাকি ছিল প্রেসে। সেটা আমাকে বললে কোনো জায়গা থেকে যোগাড় করে দিতে পারতুম না?

—তুমি তো দিতে পারতেই। কিন্তু এই ভদ্রলোক আমায় অপমান করেছিলেন, তাই ঠিক করেছিলুম, নিজে রোজগার করে ছাড়িয়ে নেবো। টিউশানি পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। তবে, আজ জানো, পত্রিকা অফিস থেকে আমার কবিতার জন্য টাকা দিয়েছে।

—দিয়েছে? সত্যি দিয়েছে?

—হ্যাঁ, ওদের কেশিয়ার ইয়ে, মানে বড় বাথরুমে গিয়েছিল, তাই দেরি হচ্ছিল। আমি সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে গেছি, তুমি এর মধ্যে রহমান সাহেবের কাছ থেকে ঐ কথা শুনেই ছুটে চলে এলে?

রহমান সাহেব তোমার লেখাটার প্রশংসা করলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রও নাকি খুব প্রশংসা করেছেন।

শিবনাথ হাঁ করে তাকিয়ে আছেন এদের দিকে। এরা দু'জন যেন ভুলেই গেছে যে এখন এরা দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রেসের অফিস ঘরে।

তিনি একবার গলা খাঁকারি দিলেন।

ইন্দ্রজিৎ সচকিত হয়ে কাবেরীর পাশ থেকে সরে এসে কাঁচুমাচুভাবে বললো, হ্যাঁ, এই যে শিবনাথবাবু, আমি খুব লজ্জিত আগে আপনার কাছে আসতে পারিনি। চতুরঙ্গ পত্রিকার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। ওখানে আমার দুটো কবিতা ছাপা হবার কথা ছিল গত মাসেই। হলো না। এ মাসে হয়েছে। আপনি দেখেছেন? আপনাকে কপি দিয়ে যাবো। আজ ওরা কবিতার জন্য টাকাও দিয়েছে। চল্লিশ টাকা। সেই টাকা আপনার কাছে রেখে দিচ্ছি। আপনার কাছে আমি ইনস্টলমেণ্টে ধার শোধ দেবো। এটুকু ফেবার

চাইছি আপনার কাছে।

শিবনাথ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। তাঁর যেন কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

আজকালকার কবিতার নামে এক অদ্ভুত, দুর্বোধ্য অপ্রয়োজনীয় কিছু ভাঙা লাইন ছাপা হলেও যে তার জন্য টাকা পাওয়া যায় এই কথাটা তিনি যেন প্রথম শুনলেন। পত্রিকার সম্পাদকদের কি মাথা খারাপ?

তিনি বিস্মিত হয়েছেন অবশ্য অন্য কারণে। তিনি বাইশ-তেইশ বছর বয়েসে ট্রেনে ধূপকাঠি বিক্রি করে প্রথম দিন লাভের কয়েকটা পয়সা দেখে যে-রকম আনন্দ পেয়েছিলেন, এই ছেলেটির মুখে অবিকল সেই রকম সাফল্যের হাসি। হেমকান্তি যেমন বলেছিল, এ ছেলেটিও তা হলে ব্যতিক্রম? অপমানিত হলেও এ ছেলে আলামোহন দাস কিংবা শিবনাথ ধর হতে চাইবে না, গুরুদেবের লাইনে যাবে। কবিতা লেখাটাও তা হলে একটা কাজ? হায় বাঙালী!

ইন্দ্রজিৎ বললো, দেখুন, এই সামান্য টাকা দিয়ে আমার ব্যাগটা ফেরত চাইবার মুখ নেই। আমি এখন থেকে মাঝে মাঝে এসে কিছু কিছু দিয়ে যাবো। একটা শুধু রিকোয়েস্ট। ঐ ব্যাগটা থেকে দু' তিনটে কাগজ নিতে পারি? ওখানে বেশ কয়েকটা কবিতা আছে, যার আর কোনো কপি নেই আমার কাছে। যদি অন্য কাগজে দিতে হয়···আমি শুধু দুটো কবিতা আর একটা চিঠি বার করে নেবো।

কাবেরী বললো, সেই চিঠিটা!

ইন্দ্রজিৎ অপরাধীর মতন মাথা নাড়লো।

কাবেরী করুণ গলায় বললো, চিঠির কোনো দাম হয়। আমাকে লেখা চিঠি একটা প্রেসের লোকের কাছে পড়ে রইলো? এই যে, শুনুন, আপনি চিঠিটা পড়েছেন? ব্যাগের কাগজপত্র ঘাটাঘাঁটি করেছেন?

শিবনাথ আবার কেঁপে উঠে বললেন না, না, আমি কিছু দেখিনি! ব্যাগটা যেমন ছিল, তেমনই ইনট্যাকট আছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি আলমারিটা খুলে ব্যাগটা বার করলেন। মুখ্যু মানুষ, আমি এর মূল্য কী বুঝবো! টাকাটাও তুলে নাও। মার্চ মাস পর্যন্ত আয়-ব্যয় হিসেব হয়ে গেছে। তোমাদের পত্রিকার জন্য ডিউটা ব্যাড ডেট হিসেবে রাইট অফ করা হয়েছে। এরকম অনেক হয়। কিন্তু এখন তোমার কাছ থেকে টাকা নিলে ইনকাম ট্যাক্স ধরবে। তোমাকে আর কিছু দিতে হবে না।

তারপর তিনি হাঁক দিয়ে বললেন, পাঁচকড়ি, সন্দেশ নিয়ে আয়।

কাবেরী বললো, না, না, আমরা সন্দেশ খাবো না। আমরা এক্ষুনি যাবো। এই ইন্দ্রজিৎ, তুমি বাবাকে দেখতে নার্সিং হোমে যাবে না।

ইন্দ্রজিৎ বললো, হ্যাঁ যাবো তো। বৃষ্টি ধরে গেছে। চলো।

শিবনাথ বললেন, একটু বসুন। পাঁচ মিনিট। তুমি মা আমাদের পাড়ার মেয়ে, উকিলবাবুর মেয়ে, তোমাকে তো চিনি। তুমি এই প্রথম প্রেসে এলে একটু মিষ্টি মুখ না করিয়ে কি তোমাকে ছাড়তে পারি? আর ইনি যে একজন কবি, তা তো জানতুম না। আমার প্রেসের ব্যবসা, সাহিত্যিক কবিরা না থাকলে তো এত রকমের প্রেস হতোই না। সেই জন্য এঁদেরও খাতির করা উচিত।

শিবনাথ হাসি মুখে এসব কথা বললেন বটে, কিন্তু তিনি ইন্দ্রজিতের দিকে তাকাতে পারছেন না। তাঁর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে। হেমকান্তির কাছে তিনি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন, তাতে হেরে গেলেন। কবিতা লেখাটাও যে একটা কাজ, তা কে জানতো! এই ইন্দ্রজিৎ শুধু কবিতা লেখে না, সে ব্যতিক্রম। তবু এই ইন্দ্রজিৎ যেন তাঁর নিজের সন্তান, তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

শিবনাথের আর একটা কথাও মনে হতে লাগলো বার বার। বাইশ-তেইশ বছর বয়েসে তিনি যখন অপমানিত হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে

যান, তখন এই কাবেরীর মতন কোনো তেজস্বিনী মেয়ে তাঁর পাশে ছিল না। কেউ তাঁর ক্ষতস্থানে প্রলেপ বুলিয়ে দেয়নি। তাঁর তুলনায় এই ইন্দ্রজিৎ ছোঁড়াটা কত সৌভাগ্যবান।

এতকাল পরেও সেই দুঃখে শিবনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়েও গোপন করলেন।

হাসি-কান্না

স্টেজের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন প্রৌঢ় রাজা। অঙ্গে ঈষৎ মলিন, লম্বা, ঢোলা, জরি বসানো মখমলের জোব্বা। গলায় সাতনরী ঝুটো মুক্তোর মালা, দু'কানে ক্রিস্টালের দুল, তাতেই আলো পড়লে হীরের মতন দেখায়। মাথায় মোগল-বাদশাদের মতন একটা সাদা পালক বসানো মুকুট। কোমরবন্ধে তলোয়ার। মুশকিল হয়েছে দু' পায়ের জুতো নিয়ে, লাল রঙের শুঁড় তোলা নাগরার একটা পাশ দিয়ে ছিঁড়তে শুরু করেছে, অন্যটায় পেরেক উঠেছে। পেরেকের দংশন সহ্য করে যাচ্ছেন ইন্দ্রনাথ, কিন্তু বাঁ পায়ের জুতোর ছেঁড়া অংশটা যাতে দর্শকদের চোখে না পড়ে, সেজন্য সচেতন থাকতে হচ্ছে সব সময়।

মঞ্চে রাজা একা, এখানে তাঁর দীর্ঘ স্বগত সংলাপ।

শুধু কণ্ঠস্বর দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারেন ইন্দ্রনাথ, গলা ইচ্ছে মতন ওঠে-নামে, তিনি ফিসফিস করলেও একেবারে শেষের সারির দর্শকরা পর্যন্ত শুনতে পায়। গলা তৈরি করার জন্য তাঁকে অনেক সাধনা করতে হয়েছে, দিনের পর দিন ভোরবেলা উঠে, দাঁত না মেজে, চ্যাঁচাতে হয়েছে বরানগরের গঙ্গার ধারে। তবু এগারো মিনিটের টানা একা একা কথা বলায় যদি দর্শকদের ধৈর্য নষ্ট হয়ে যায়, তাই কিছু কিছু 'বিজনেস' ঠিক করে নিয়েছেন ইন্দ্রনাথ। এগারো মিনিট কম সময় নয়। প্রজা বিদ্রোহের ফলে কালকেই এই রাজাকে সিংহাসন ছেড়ে, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে, রাজ্য ত্যাগ করে চলে যেতে হবে, তাই ভগ্নহৃদয় রাজা স্মৃতিচারণ করতে করতে এক একবার এক একটা প্রিয় জিনিস তুলে দেখবেন, কখনো তাঁর পিতার ছবির কাছে বসবেন হাঁটু গেড়ে, কখনো ফুট লাইটের একেবারে কাছে এগিয়ে গিয়ে দর্শকদেরই সম্বোধন করবেন প্রজা হিসেবে।

দৃশ্যটি গাম্ভীর্য-বিষাদে মেশা, তবে ইন্দ্রনাথ দুঃখের কথা উচ্চারণ করেন খানিকটা শ্লেষের সঙ্গে।

দর্শকদের সংখ্যা আড়াই-তিন হাজার তো হবেই, একটা স্কুলের মাঠে প্যাণ্ডেল করা হয়েছে। যাত্রা নয়, একটি জার্মান নাটকের ভাবানু-বাদ, প্রয়োগরীতি পুরোপুরি আধুনিক, আজকাল মফস্বলের দর্শকরাও এসব ভালো ভাবে নেয়। অডিয়েন্সের মধ্যে একেবারে পিন ড্রপ সাইলেন্স যাকে বলে।

মনোলগ শেষ হবার পর রাজা কয়েক মুহূর্ত থামবেন, তারপর অনুপস্থিত বিদ্রোহী প্রজাদের উদ্দেশে বলবেন, আজকের রাতটা অন্তত আমাকে শান্তিতে ঘুমোতে দাও!

এবার ঘুরে দাঁড়াতে গেলেই তার মাথা থেকে খসে পড়বে মুকুটটা। এটা একটা প্রতীক। মঞ্চের ওপর মুকুটটা গড়াবে, তিনি লোভীর মতন ছুটে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরবেন। ঠিক তক্ষুনি নেপথ্যে শোনা যাবে প্রচণ্ড কোলাহল, তারপর গুলির শব্দ। তিনি উদভ্রান্তের মতন তাকাবেন, আধ মিনিট পরে ডান দিকের উইংস দিয়ে ঢুকবে ভগ্নদূত। সে এসে খবর দেবে, রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবদত্ত খুন হয়েছে।

ইন্দ্রনাথ এমনভাবে ঐ ঘুরে দাঁড়ানোটা প্র্যাকটিস করেছেন যে মুকুটটা ঠিক মঞ্চের একটু দূরে ছিটকে পড়ে খানিকটা গড়ায়। মাথাটা ঝাঁকাবার একটা কায়দা আছে। তারপর তিনি মুকুটটা কুড়িয়ে নিয়ে বুকে তুলবেন, তখন নেপথ্যে চ্যাঁচামেচি ও গোলাগুলির শব্দ শুনে মূহুর্তে মূহুর্তে তার মুখের এক্সপ্রেশান বদলাবে, এই জায়গায় প্রত্যেক শো-তে ইন্দ্রনাথ হাততালি পান।

মুকুটটা ঠিকমতনই গিয়ে পড়ল, রাজা গিয়ে সেটা বুকেও তুলে নিলেন। যদিও ঘোরার সময় জুতোর পেরেকটা খুব জোর কামড়ে দিল আবার, কিন্তু নেপথ্যের কোলাহল কিংবা গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেল না।

ওসব আজকাল টেপ করা থাকে, ঠিক সময় একজন উইংসের পাশে একটা মাইক্রোফোনের সামনে টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে দেয়। এর আগে এই নাটকের সাতাশটা শো হয়ে গেছে, একবারও এরকম গণ্ডগোল হয়নি।

ইন্দ্রনাথ মুকুটটা বুকে চেপে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু মুখের এক্সপ্রেশান দিতে পারছেন না। প্রতি মুহূর্তে ভাবছেন এবার শব্দগুলো হবে। মঞ্চের ওপর প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। এক্সপ্রেশান দেবার জন্য টাইম নেওয়া আর পার্ট ভুলে যাওয়া নীরবতার তফাত দর্শকরা ঠিকই বুঝতে পারে। ম্যানেজ করার জন্য ইন্দ্রনাথ মুকুটটা আবার ফেলে দিলেন মঞ্চে, আবার হুমড়ি খেয়ে সেটা কুড়োলেন। যাতে মুকুটটা যে তাঁর কাছ থেকে চলে যেতে চাইছে, এটা দর্শকরা ভালো করে বোঝে।

তবু সেই কোলাহল আর গোলাগুলির শব্দ হলো না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইন্দ্রনাথ একবার তাকিয়ে ফেললেন বাঁ দিকের উইংসে। তখনই ডান দিকের থার্ড উইংস থেকে ঢুকে পড়লো ভগ্নদূতবেশী তপন।

আগের সেই এক্সপ্রেশানটা আর দেওয়া হলো না, ভগ্নদূতের মুখে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন মূর্তির মতন হয়ে গেলেন রাজা। এখানে তাঁর হাহাকারের সুরে দু'বার দেবদত্ত, দেবদত্ত নাম উচ্চারণ করার কথা ছিল। তার বদলে নতুন সংলাপ দিলেন ইন্দ্রনাথ, দেবদত্তকে ওরা কেড়ে নিলো?

একটু থেমে তিনি বললেন, আমি সহ্য করতে পারবো, আমার বুকটা পাথর, কিন্তু ওর মা কি পারবে? ওরে, তোরা রানীকে এখন কিছু বলিস না!

বলতে বলতে শেষের দিকে ইন্দ্রনাথের গলা ভেঙে যায়। যেন তীব্র একটা কান্না তিনি চেপে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আজ তেমন জমলো না।

মঞ্চ অন্ধকার হতেই এক লাফে ভেতরে এসে ইন্দ্রনাথ গর্জন করে উঠলেন, কী হলো? টেপ বাজলো না কেন? হরিষিত কোথায়?

ইন্দ্রনাথের গলার আওয়াজ দর্শকরা শুনে ফেলতে পারে বলে তপন তার হাত ধরে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললো, আস্তে ইন্দ্রদা, দাঁড়ান সব বলছি।

ইন্দ্রনাথ তপনকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন, টেপ বাজালো না কেন আমি জানতে চাই! কোথায় গেল সেই শুয়োরের বাচ্চা হরষিত?

তপন বললো, হরষিত মাইকের সামনেই বসেছিল। কিন্তু···

কথা শেষ করতে দিলেন না ইন্দ্রনাথ। আবার ধমকে উঠে বললেন, কিন্তু? কিসের কিন্তু? শো-এর সময় কোনো কিন্তুর স্থান নেই! সাউণ্ড এফেক্ট কেন হলো না আমি জানতে চাই!

উইংসের কোনো পাশেই হরষিত নেই, তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আরও দু'তিনজন এসে ভিড় করলো ইন্দ্রনাথের পাশে। একটু দূরে, বুকের সামনে হাত দুটো জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে রুমা, তার অঙ্গে রানীর সাজসজ্জা, সে এদিকে একবার তাকালোও না।

ধুত বলে পা থেকে নাগরা-জোড়া খুলে ফেলে ইন্দ্রনাথ রক্তচক্ষে অন্যদের মুখে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে হারামজাদা কোথায় গেল? আই ওয়াণ্ট অ্যান এক্সপ্লানেশান। সে কী ভেবেছে, এটা গ্রুপ থিয়েটার না পাড়ার ফাংশান?

কেউ কিছু উত্তর দিল না। ইন্দ্রনাথ দৌড়ে চলে গেলেন খুঁজতে।

সবাই জানে, রাগলে ইন্দ্রনাথের মাথায় রক্ত চড়ে যায়, কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হরষিত একটা দোষ করে ফেলেছে বটে, তার জন্য সে অন্যদের কাছে বকুনি খেয়েছে। ইন্দ্রনাথ শাস্তি দিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলবেন। তা ছাড়া এখনো শেষের পাঁচটা ভাইটাল সিন্ বাকি আছে, তার মধ্যে ঝামেলা করা ঠিক নয়। শো-টা শেষ হয়ে যাক না।

তপন এসে রুমাকে অনুরোধ করলো, তুমি একটু ইন্দ্রদাকে ডাকো না! ওর মাথা গরম হয়ে গেছে তুমি ডাকলে শুনবে!

রুমা কোনো উত্তর দিল না, তপনের দিকে তাকালোও না। তার

চোখ দুটি যেন অশ্রুভার নত।

তপন আবার ডাকলো, এই রুমা।

রুমা তবু কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখালো না।

রুমার একটু পরেই এন্ট্রান্স। রুমার এই একটা অদ্ভুত স্বভাব, যতক্ষণ শো চলে সে কারুর সঙ্গে একটাও অপ্রয়োজনীয় কথা বলে না, যে-দিন যে-ভূমিকাটা করে, সেদিন অবিকল সেই চরিত্রটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে উইংসের পাশে। এই নিয়ে ইন্দ্রনাথও হাসাহাসি করেছেন অনেক সময়। নাটকের চরিত্রের সঙ্গে এতটা ইনভলমেণ্ট ভালো নয়। স্ট্যানিস্লাভস্কি বলেছেন, তুমি যখন রাজার ভূমিকায় অভিনব করবে, তখন তুমি নিজেকে একজন রাজা ভাববে না, কারণ আসল রাজারা যে মঞ্চে রাজার ভূমিকায় ভালো অভিনয় করতে পারবে, তার কোনো মানে নেই। তুমি সব সময় মনে রাখবে, তুমি রাজার ভূমিকায় অভিনয় করছো, অভিনয়টাই বড় কথা।

তপন বুঝলো, রুমার কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

ইন্দ্রনাথ মঞ্চের পেছনের অন্ধকারে বাঘের মতন গজরাতে গজরাতে ছুটে বেড়াচ্ছেন। মঞ্চে এখন দশ-বারোজন একসঙ্গে, বিদ্রোহীদের নেতা বক্তৃতা দিচ্ছে, প্রচুর চ্যাঁচামেচি, তাই দর্শকরা অন্য আওয়াজ শুনতে পাবে না।

অন্য সব জায়গা, এমন কি বাথরুম পর্যন্ত খুঁজে এসে ইন্দ্রনাথ উঁকি মারলেন গ্রীনরুমে। মেক-আপ ম্যান জামালুদ্দিনের পাশে একটা টুলে বসে আছে হরষিত। তার মুখে নকল দাড়ি, ভুরুতে গভীর কাজল, সে মাথার চুলে এক হাত ডুবিয়ে বসে আছে মাটির দিকে চেয়ে।

ইন্দ্রনাথ তার সামনে এসে বললেন, এই শালা, টেপ বাজাসনি কেন? কী হয়েছিল? প্লেয়ারটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

হরষিত কোনো উত্তর দিল না। কোনো একটা মিথ্যে কৈফিয়ত দেবার ক্ষমতাও তার নেই। একটা গভীর লজ্জার কুয়াশা যেন ঘিরে আছে তাকে।

ইন্দ্রনাথ আবার হুংকার দিয়ে উঠলেন, কী হয়েছিল বল। আজ আবার মাল খেয়েছিস? নেশা করে বসে আছিস?

জামালুদ্দিন বলে উঠলো, না না, ইন্দ্রদা, মাল খায়নি!

ইন্দ্রনাথ বললেন, শো-এর দিন কেউ মাল খেলে আমাদের গ্রুপে তার জায়গা নেই, এ কথা কতবার বলেছি?

জামালুদ্দিন জোর দিয়ে বললো, আজ ও মাল খায়নি!

ইন্দ্রনাথ বললেন, মাল খায়নি তবে ও কী করছিল? প্লেয়ারটা সামনে নিয়ে বসে, ওরকম একটা ক্রুশিয়াল মোমেণ্টে, এই শুয়োরের বাচ্চা, কথা বলছিস না কেন?

হরষিত তবু মুখ নীচু করে আছে, জামালুদ্দিন এগিয়ে এসে কাচু-মাচু ভাবে হেসে বললো, মাল খায়নি হঠাৎ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, নতুন বিয়ে করেছে তো।

যেন হঠাৎ সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন, এমন বিস্ময়ের সঙ্গে ইন্দ্রনাথ বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছিল? শো চলার সময় যে ঘুমোয়, সে আমার গ্রুপ থিয়েটার মুভমেণ্ট করতে আসে! আমার সিনটা ওই নষ্ট করে দিল! ওকে আমি নিজে এই দলে এনেছি, কাজ শিখিয়েছি।

ইন্দ্রনাথ খপ করে হরষিতের চুলের মুঠি চেপে ধরে বললেন, হারামীর বাচ্চা, বাঞ্চোৎ

তাতেও না থেমে ইন্দ্রনাথ প্রথমে হরষিতের গালে একটা প্রবল চড় কষালেন, তারপর ক্যাঁত করে একটা লাথি মারলেন। টুল সুদ্ধু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল হরষিত।

জামালুদ্দিন দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো ইন্দ্রনাথকে। ততক্ষণে তপনও এসে গেছে। কিন্তু তারা দু'জনেও ইন্দ্রনাথকে সামলাতে পারছে না। ইন্দ্রনাথ দীর্ঘকায় পুরুষ, শরীরে বেশ শক্তি আছে, দুর্দমনীয় রাগে তাঁর জোর অনেক বেড়ে গেছে।

সারা গ্রীন রুম জুড়ে এরকম ধস্তাধস্তি চলছে, এর মধ্যে একটি ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, ইন্দ্রদা, আপনি এখানে? এক্ষুনি

আপনার এন্ট্রান্স, কোরাস গানটা শেষ হয়ে গেলেই একটা জ্বলন্ত স্টোভের সুইচ যেন পট করে অফ করে দেওয়া হলো। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে চোখ ঘষলেন ইন্দ্রনাথ। তারপর লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন ব্যাক স্টেজের দিকে।

তপনও সঙ্গে এসেছে। ইন্দ্রনাথ প্রৌঢ় রাজায় রূপান্তরিত হয়ে ডান দিকের উইংস দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছেন, তপন তাঁর হাত চেপে ধরে বললে, ইন্দ্রদা, খালি পা!

প্রোডাকশানের একটি ছেলে নাগরাজোড়া কুড়িয়ে নিয়ে এলো। ইন্দ্রনাথের একটা পা প্রায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তবু সেই পেরেক-ওঠা জুতোয় পা গলিয়ে তিনি মঞ্চে প্রবেশ করলেন।

এরপর দুটো সিন ঠিকঠাক হয়ে গেল।

পরের সিনটায় ইন্দ্রনাথের কিছু নেই, প্রায় তের মিনিট গ্যাপ। ইন্দ্রনাথ আলোর সুইচবোর্ডের পাশে পাশে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালেন জুতো খুলে ফেলে প্রোডাকশনের ছেলেটাকে ডেকে বললেন, ফার্স্ট এড কিটের মধ্যে ডেট্ল আছে কি না দ্যাখ তো! আমার পা-টা বোধহয় গেল! ড্রেসাররা কী পোড়ারছাই জুতো দিয়েছে, ওদের পেমেন্ট বন্ধ রাখবে!

তপন কাছে এসে ফিসফিস করে বললো, ইন্দ্রদা, একটা কেলেংকারি হয়ে গেছে!

ইন্দ্রনাথ বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আবার কী হলো?

তপন বললো, হরষিত হাওয়া হয়ে গেছে।

একটু আগে হরষিতকে নিয়ে যে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে সেটা যেন ইন্দ্রনাথের মনেই নেই। তিনি অনেকখানি ভুরু তুলে বললেন, হাওয়া হয়ে গেছে মানে? কোথায় গেছে?

তপন বললো, রাগ করে কোথায় যেন চলে গেছে। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্রনাথের মনে পড়লো। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, চুলোয় যাক! দূর হয়ে যাক। নিমকহারাম, কুত্তার বাচ্চা! ছিল একটা

লোয়ার ডিভিশান ক্লার্ক, আমি তাকে হাতে ধরিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে।

তপন বললো, লাস্ট সিনে হরষিতের পার্ট আছে যে। কী হবে?

ইন্দ্রনাথ বললেন, বাদ দে! বাদ দে!

তপন বললো, ওর ঘাতকের পার্ট। বাদ দেওয়া হবে কী করে? কী বলছেন, ইন্দ্রদা?

ইন্দ্রনাথ তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন। তার মুখে বেদনা ও অভিমানের ছায়া সরে সরে যেতে লাগলো। মঞ্চে নাটক চলছে, একজন অভিনেতা সেই সময় নিজের পার্ট ছেড়ে যে চলে যেতে পারে, এটা যেন তিনি কল্পনাই করতে পারছেন না। অনেক কষ্ট করে একটা দল গড়তে হয়।

ঘোর ভেঙে তিনি বললেন, ঠিক আছে। তুই মেক-আপ নে। তুই পার্টটা চালিয়ে দে।

তপন বললো, আমি? ওই সিনের প্রথম দিকে আমারও যে অ্যাপিয়ারেন্স আছে!

ইন্দ্রনাথ বললেন, তোর ক্রাউড সিন, দুটো ডায়ালগ। সেটা বাদ দিলে ক্ষতি নেই। হরষিতকে ওই রোল থেকে আমি সরাবোই ভাবছিলাম। হারামজাদাটা ভালো করে কাঁদতেও জানে না।

তপন তবু একটু ইতস্তত করে বললো, আমাকে বয়েসে ঠিক মানাবে না। উইগ পরবো?

ইন্দ্রনাথ বললেন, কিছু দরকার নেই। চুলে একটু কালো ব্রাশ চালিয়ে নে। যা, যা, জামালকে বল জলদি দাড়ি সেঁটে দেবে।

তপন হাসলো। সে এই গ্রুপের ঝালে-ঝোলে সব কিছুতেই আছে। নামে সে সহকারি পরিচালক এবং স্টেজ ম্যানেজার। প্রত্যেক নাটকে সে তিন-চারটে ছোট খাটো পার্টও করে। লোকবল কম, এক একজনকেই দু'তিন রকম কাজ সামলাতে হয়। প্রত্যেক রিহার্সালে উপস্থিত থাকে বলে নাটকের সংলাপই তপনের মুখস্থ।

তপন বেশ বেঁটে, সেই জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ, বড় ভূমিকা তাকে

ঠিক দেওয়া যায় না। তাতে তপনের কোনো আফসোস নেই, সে মঞ্চের অন্তরালের কাজকর্মেই বেশ খুশী।

ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক এবং সাউণ্ড এফেক্ট দেওয়াই হরষিতের কাজ। তা ছাড়া সে শেষ দৃশ্যে ঘাতকের ভূমিকায় মঞ্চে নামে। ঘাতক মানে প্রৌঢ় রাজার বাল্যবন্ধু। রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে ভগ্নহৃদয় রাজা জঙ্গলের পথে পালাচ্ছেন, বিদ্রোহীরা তাঁকে তাড়া করে আসছে। এই সময় বাল্যবন্ধু মনোজিতও যে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছে, রাজা তা জানেন না। মনোজিতের ভূমিকাটা অনেকটা জুলিয়াস সিজারের বন্ধু ব্রুটাসের মতন।

মনোজিৎকে দেখে রাজা হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, বন্ধু আমাকে আশ্রয় দাও। আমি সিংহাসন চাই না, রাজত্ব চাই না, শুধু আর কিছুদিন বাঁচতে চাই। এই রূপ-রস-গন্ধময় পৃথিবী ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না, আমাকে সাধারণ মানুষের মতন কিছুদিন বেঁচে থাকতে দাও।

মনোজিৎ বললে, রাজাকে বাঁচিয়ে রেখে রাজতন্ত্র খতম করা যায় না।

তারপর সে রাজার বুকে আমূল বিদ্ধ করবে ছুরি। ঘুরে পড়ে যাবে রাজা। একটুক্ষণ তার শরীরটা ছটফট করবে, তখন হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠবে মনোজিৎ। রাজা নয়, নিজের বাল্যবন্ধুর মৃত্যু দেখে কান্না।

এর পরে বিদ্রোহিদের নেতা এসে মনোজিৎকে অভিনন্দন জানাবে, তখনও মনোজিৎ কান্না থামাতে পারবে না। কান্নাটাই তার আসল অভিনয়।

তপন মনোজিতের মেক-আপ নিয়ে এসে বললো, নাঃ হরষিতটা চলেই গেছে। জামাল বললো, ও বোধ হয় স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবে।

ইন্দ্রনাথ তপনের মেক-আপটা পরীক্ষা করে দেখে বললেন, ঠিক আছে, চলে যাবে। আমি বাঁ দিকে ঘুরে দাঁড়াবো, তুই ছুরিটা আমার বগলের নীচ দিয়ে চালিয়ে দিবি। আমি মাটিতে পড়ে যাবার পর দশ

গুণে তারপর কান্না শুরু করবি, ঐটুকু টাইম না দিলে এফেক্ট হবে না।

মঞ্চে তখন বিদ্রোহিদের উল্লাস ও হাসি-ঠাট্টা চলছে, উইংসের পাশ দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন ইন্দ্রনাথ। বিদ্রোহীদের নেতা হিসেবে সুকুমার খুব ফাটাচ্ছে। এর পরের সিনটাই রুমার। রুমা আজ দু'বার ক্ল্যাপ পেয়েছে।

শেষ পর্যন্ত নাটকটা উৎরে গেল ভালো ভাবে। দর্শকদের অনুরোধে, পর্দা ফেলে দেবার পরেও আবার পর্দা তুলে, সবাই একসঙ্গে মঞ্চে এসে দাঁড়ালো, তারপর রুমা আর সুকুমারকে দু' পাশে নিয়ে ইন্দ্রনাথকে এগিয়ে যেতে হলো ফুটলাইটের সামনে।

ইন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু আজকের পারফরমেন্সে খুশী নন। কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। গোমড়া মুখে তিনি গ্রীনরুমে গিয়ে মেক আপ তুলতে লাগলেন। সেই অবস্থাতেই নির্দেশ দিতে লাগলেন কয়েক-জনকে, এই, ড্রেসগুলো সব ঝটপট প্যাক করে ফ্যাল···বাস রেডি আছে তো? খাবারের ব্যবস্থা কী হলো? ঠিক দেড়টার সময় স্টার্ট দেবো, এক মিনিট দেরি না হয়···

মফস্বলে নাটক শুরু করতে হয় দেরিতে। শো-এর পর খাওয়া দাওয়া। সব কিছু গোছ-গাছ করে নিয়ে বাস ভর্তি করে বেরিয়ে পড়তে হবে মাঝরাতে। সকালবেলা ফিরেই অফিস। গ্রুপ থিয়েটারের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই জীবিকার জন্য কিছু একটা চাকরি-বাকরি করতে বাধ্য হয়। বাইরে কল শো-তে এলে ধকল যায় অনেক। কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম কল শো না নিলে প্রোডাকসানের খরচ তোলা যায় না।

প্রত্যেকটা শো শুরু হবার আগে থাকে টেনশান, শেষ হয়ে যাবার পর এসে যায় সার্থকতার অবসাদ। সুকুমার আর দু'তিনজন এই সময়টায় কোথাও অন্ধকার ঘুপচি খুঁজে একটু আধটু রাম-হুইস্কি পান করে। ইন্দ্রনাথ নিজে এক ফোঁটাও মদ খান না, তাঁর গ্রুপে মদ খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে, কিন্তু এই সময়টায় সুকুমাররা লুকিয়ে চুরিয়ে যে খায়, তা ইন্দ্রনাথ ঠিক টের পেয়ে গেলেও না-দেখার,

না-জানার ভান করেন। এর পর বেচারারা সারা রাত চলন্ত বাসে ঘুমোতে ঘুমোতে যাবে।

রুমার আগেই মেক-আপ তোলা হয়ে গেছে সে এখন পরে নিয়েছে শালোয়ার আর ঢোলা কামিজ। সুকুমারদের কাছে এসে সেও দু' ঢোঁক রাম খেল, একজনের কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে দিল কয়েকটা টান। গ্রুপের সকলের সঙ্গেই রুমার ভাব। অনেকেরই গায়ে গা ঠেকিয়ে সে বসে, কয়েকজনের গলা জড়িয়ে ধরে সে কথা বলে। এর পেছনে একটা গূঢ় কারণও আছে। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, তা সে অন্যদের জানাতে চায় না। এই গ্রুপটাকেই সে আর সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালবাসে। কিছুদিন আগে রুমা তার কলেজে পড়াবার চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। সেই জন্য সে গ্রুপের জন্য বেশি সময় দিতে পারে। রুমা বিয়ের কথাও চিন্তা করে না। তার ধারণা, সার্থক অভিনেত্রী হতে হলে সংসার-টংসারের ঝামেলা নেওয়া চলে না।

শো-এর সময় থমথমে মুখ করে থাকে রুমা, শেষ হয়ে যাবার পর এই সময়টায় সে ঠাট্টা-ইয়ার্কি আর হাসাহাসিতে মেতে উঠে হাল্কা হতে চায়। প্রত্যেক শো-তেই কিছু না কিছু মজার ব্যাপার ঘটেই।

কিন্তু আজ সবাই ফিসফিস করে হরষিতের কথা আলোচনা করছে। ইন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভও ফুটে উঠছে অনেকের কথায়। নিরীহ, ভালোমানুষ গোছের হরষিতকে অনেকেই পছন্দ করতো। টিমের একজন কেউ অভিমান করে চলে গেলে সকলেরই খারাপ লাগে। হরষিত কিছু খায়নি, সে কখন নিঃশব্দে সরে পড়লো, শুধু জামাল নাকি তাকে জোর করে আটকাবার চেষ্টা করেও পারেনি।

রুমা আর এক চুমুক রাম খেয়ে চলে এলো গ্রীন রুমে।

ইন্দ্রনাথের সামনের ডেস্কটার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে, ইন্দ্রনাথের হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা নিয়ে সে ঝাঁঝালো গলায় বললো, তুমি আজ হরষিতকে মেরেছো?

ইন্দ্রনাথ দপ্ করে জ্বলে উঠে বললেন, সে হারামজাদার নামও কেউ

আর উচ্চারণ করবে না আমার সামনে। সে বিদায় হয়েছে, আমি বেঁচেছি! অপদার্থ একটা!

রুমা পা দোলাতে দোলাতে খুব শান্ত গলায় বললো, এত চেঁচিয়ে কথা না বললেও চলবে। এখানে এক হাজার অডিয়েন্স নেই। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তুমি হরষিতকে মেরেছো? ইয়েস অর নো?

ইন্দ্রনাথ গলা নামালেও দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন না মারিনি। মারা বলতে কী বোঝায়? গুণ্ডামি! আমি হরষিতকে মোটেই মারিনি, আমি তাকে শাস্তি দিয়েছি। এই গ্রুপের ফাউণ্ডার-প্রেসিডেণ্ট হিসেবে কারুর কাজের গাফিলতি দেখলে তাকে শাস্তি দেবার অধিকার নিশ্চই আমার আছে। সে কী করেছে তুমি জানো?

রুমা বললো, বিচার না করেই শাস্তি। তাকে তুমি কিছু বলার সুযোগ দিয়েছো?

ইন্দ্রনাথ বললেন, হ্যাঁ, আমি তাকে অন্তত দু'বার জিজ্ঞেস করেছি, সে ম্যাদামারার মতন ঠোঁট বুজে ছিল। উত্তর দেবার মতন তার কিছু ছিল না, বুঝলে! সে শুয়োরের বাচ্চা কাজে ফাঁকি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল! ক্যান ইউ বীট ইট? বাঞ্চোৎকে আমি মেরেছি মানে কী, তখন যে ওকে খুন করে ফেলিনি···

রুমা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললো, বাঃ বাঃ, কী চমৎকার ভাষা! বিচারকের ভাষা! তুমি বিচারক না জল্লাদ?

ইন্দ্রনাথ রুমার দিকে কয়েক মুহূর্ত কটমট করে তাকিয়ে থেকে বললেন, এখান থেকে ফোটো তো! এখন আমার বাজে বকবক করতে ইচ্ছে করছে না। খাবারটা কখন দেবে? খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

রুমা বললো, আমি এখন বকবক করার মুডে আছি। তুমি তোমার ঐ অনার্য ভাষা যত ইচ্ছে আমার ওপর চালাতে পারো!

ইন্দ্রনাথ বললেন, আমি সবাইকে মোটেই খারাপ গালাগাল দিই না। যারা আমার মেজাজ গরম করে দেয়···তুমি সুজন, জামাল, মধুদের জিজ্ঞেস করো, ওদের আমি কখনো খারাপ ভাষায় ধমকেছি?

যারা ঘড়ির কাঁটা ধরে, মন দিয়ে সব কিছু ঠিকঠাক করে…

রুমা বললো, কেউ যদি একটু দোষ করেও ফেলে, তা হলেই তুমি তাকে ওই সব বিশ্রী কথা বলবে? তোমার নিজেরও তো একটা সম্মান আছে। একজন নাট্য পরিচালকের নিজস্ব ডিগনিটি থাকবে না?

ইন্দ্রনাথ এক টান দিয়ে রাজার পরচুলাটা খুলে ফেলে দূরে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর বললেন, আমি শুধু পরিচালক না, আমি একজন একটর। আমাকে সব রকম ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। শেক্স্পীরিয়ান নাটকে রাজার ডায়ালগ থেকে খুনে-গুণ্ডা বদমাসের মুখখিস্তি পর্যন্ত সবই আমার মুখে আসে গড়গড়িয়ে। একজন অভিনেতার কাছে আবার খারাপ ভাষা, ভালো ভাষা কী? একজন সাধুর ডায়ালগ আর একটা খুনে-গুণ্ডার ডায়ালগ একজন অভিনেতার কাছে সমান ইম্পর্টেন্ট, ডোণ্ট ফরগেট দ্যাট। ইন্দ্রনাথ উত্তেজিত হলেও মুখে হাসি ফুটিয়েরেখেছে রুমা। মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে সে খুব মিষ্টি করে বললো, তুমি স্টেজে খুনে-গুণ্ডার রোলে যতখুশী মুখখিস্তি করতে পারো, কিন্তু তা বলে সব সময়, স্টেজের বাইরেও তুমি যে অন্যদের যা তা বলো, সেগুলোও কি নাটকের ডায়ালগ? এটা তোমার কী ধরনের আরগুমেণ্ট, ইন্দ্র?

একটুখানি তোতলাতে শুরু করলেন ইন্দ্রনাথ। ঘামে চকচক করছে কপাল। এ ঘরের পাখাটা ঘুরছে আস্তে আস্তে, তাতে আবার ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে মটমট করে রেগুলেটারটা ঘুরিয়ে দিলেন তিনি। তাতেও কোনো কাজ হলো না। আরও বিরক্তির সঙ্গে তিনি বললেন, জীবনটাই নাটক, এ কথাটা খুব ক্লিশে আর মানডেন শোনাবে, তবু এটাই সত্যি, অন্তত আমার জীবনে। নাটকের জন্য, গ্রুপ থিয়েটারের জন্য আমি যত রক্ত জল করেছি, সে রকম তোমরা কেউ করোনি? আমি যাত্রায় যাইনি বম্বে ফিলিমেও যাইনি, কতবার ডেকেছে তোমরা জানো না! আমার কাছে এই গ্রুপের স্বার্থটাই সবচেয়ে বড়, সেই জন্যই কারুর গ্রস নেগলিজেন্স দেখলে আমার মাথায় আগুন জ্বলে যায়।

দরজার কাছে তপন, রবি, তনিমা, জয়শ্রী ফিরোজদের একটা ছোট-খাটো ভিড় জমে গেছে। ইন্দ্রনাথের মুখের ওপর কথা বলতে এরা কেউ সাহস পায় না, এ:দর চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এদের সমর্থন রুমার দিকে।

রুমা একবার ওই দলটিকে দেখে নিল, তারপর বললো, তুমি যখন তখন লঘু পাপে গুরু দণ্ড দাও, ইন্দ্র। হরষিত বেচারা নতুন বিয়ে করেছে, কাল রাত্তিরে ও বোধ হয় ঘুমোতে পারে নি, আজ দুপুর থেকে সেই সাজানো থেকে শুরু করে ইলেকট্রিকের লাইন টানা, কত রকম খাটাখাটুনি করেছে, তারপরে যদি হঠাৎ একটু ঘুম পেয়ে যায়···

ইন্দ্রনাথ বোমা ফাটার মতন শব্দ করে বলে উঠলেন, নতুন বিয়ে করেছে বলে শো-এর সময় ঘুমোবে? এটা লঘু অপরাধ? মাগ্-ছেলেপুলে নিয়ে যারা সংসার করতে চায়, তারা করুক না। তাদের কে গ্রুপে আসতে বলেছে? ঐ হরষিতকে কী রকম হাতে ধরে ধরে আমি কাজ শিখিয়েছি তা জানো? একটা গেঁয়ো ভূত ছিল, ভালো করে কথাই বলতে পারতো না। নিজে যেচে সাইউ এফেক্টের দায়িত্ব নিয়েছিল, বউয়ের সঙ্গে যদি রাত জাগতে চায় তো ওই দায়িত্ব আজ অন্য কারুকে দিলেই পারতো! ওর আবার অভিনয় করার শখ! লাস্ট সিনে ওই ঘাতকের পার্টটা, রিহার্সালে কী রকম ধ্যাড়াতো মনে নেই! আমি নিজে ওর বাড়িতে গিয়ে আলাদা করে রিহার্সাল দিইয়েছি, অন্তত পঞ্চাশ বার, সেই পার্ট না করে সে আজ চলে গেল? কত বড় নিমকহারাম সে! পণ্ডশ্রম করেছি ওকে নিয়ে! ওঃ!

দরজার কাছের ভিড়টা থেকে তনিমা বললো, ইন্দ্রদা, আমি একটা কথা বলবো?

রুদ্র মূর্তিতে সে দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ বললেন, ইয়েস? প্রত্যেকেরই কথা বলার রাইট আছে। কী বলতে চাও বলো!

তনিমা বললো, আমার তো ফার্স্ট সিনের পরই ছুটি। তাই আমি মেক-আপ তুলে দর্শকদের মধ্যে গিয়ে বসেছিলুম। অডিয়েন্স রি-অ্যাক-

শান দেখছিলুম। আপনার ঐ জায়গাটায় কেউ কিছু বুঝতে পারে নি। মানে, নাটকটা যারা আগে দেখেনি, তারা তো জানেই না যে ওইখানটা চ্যাঁচামেচি আর গুলিগোলার আওয়াজ হবার কথা ছিল। সেই জন্য কেউ কিছু ধরতেই পারে নি।

ইন্দ্রনাথ সকলের মুখে চোখ বুলিয়ে তারপর রুমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি ফেলে বললেন, কেউ কিছু বুঝতে পারে নি?

রুমা জোর দিয়ে বললো, কেউ বোঝে নি। একটুও গোলমাল হয় নি, কেউ হাসে নি। তুমি ভালো ম্যানেজ করে দিয়েছো।

ইন্দ্রনাথ আবার বললেন, কেউ বোঝে নি! তোমরা দর্শকদের খুব বোকা ভাবো, তাই না? দর্শকদের যারা বোকা মনে করে, তারা কোনোদিন নাটকের অভিনয়টাকে সত্যিকারের আর্টের স্তরে নিয়ে যেতে পারে না। কলকাতায় স্টেজ কিংবা যে-কোনো অজ পাড়াগাঁয়ে কল শো-তে গেলেও, মনে রাখবে, দর্শকদের মধ্যে অনেক গোলা লোক থাকে ঠিকই, তাদের তুমি যা দেবে তাই-ই হাঁ করে গিলবে, কিন্তু, সব সময় মনে রাখতে হয় যে দর্শকদের মধ্যে অন্তত একজন আছে, যে সব কিছু বোঝে, সে আমাদের প্রতিটি মুভমেণ্ট খুঁটিয়ে লক্ষ করে, তাকে খুশী করতে না পারলে অভিনয় করার কোনো মানেই হয় না!

রুমা বললো, সেরকম কেউও পরে আপত্তি জানায় নি!

চোখ কুঁচকে, দু'হাত ঝাঁকিয়ে ইন্দ্রনাথ দারুণ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, আঃ! সেই আলটিমেট দর্শক মুখে কখনো আপত্তি জানায় না। সেটা ফিল করতে হয়। আমি ফিল করেছি! হরষিত সাউণ্ড এফেক্ট দিল না, অমনি আমার সুর কেটে গেল, তারপর অভিনয় চালিয়ে যেতে আমার এত কষ্ট হচ্ছিল···আমায় পায়ে···আমার পায়ে যদি একটা জুতোর পেরেক ফুটতো, আমাকে, আমাকে যদি একটা কাঁকড়া বিছে কামড়ে দিত, তা সত্ত্বেও আমি ঠিক অভিনয় চালিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু বেসুরো মন নিয়ে অভিনয় করা, ওঃ, তার চেয়ে কষ্ট আর কিছু নেই!

রুমা বললো, তবু যাই বলো, তুমি গ্রুপের একজনকে লাথি মারবে ?

টেবিলে এক ঘুষি মেরে ইন্দ্রনাথ বললেন, বেশ করেছি !

জামাল দু'হাত তুলে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললো, এখন এসব কথা থাক। কলকাতায় ফিরে এসব আলোচনার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

রুমার দিকেও সে চোখের ইঙ্গিতে অনুরোধ জানালো। এখন তর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই, ইন্দ্রনাথের রাগ ক্রমশই চড়বে।

রুমা তবু নিবৃত্ত হলো না। মুখের হাসি এই প্রথম মুছে ফেলে সে বললো, তুমি এটা খুব ভুল করছো, ইন্দ্র। তুমি এই গ্রুপের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছো, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছো, তা আমরা মানি সবাই, কিন্তু তা বলে যখন তখন তুমি মাথা গরম করে এক একজনকে কুচ্ছিৎ গালাগাল দেবে, কিংবা চড়-লাথি মারবে, এটা কিছুতেই টলারেট করা যায় না। এই করে দল ভাঙে। আজ হরষিত চলে গেছে, কাল অন্য কেউ চলে যাবে। গ্রুপ থিয়েটারগুলো অনবরতই ভাঙছে, এক থেকে দুই হচ্ছে, দুই থেকে চার দল হচ্ছে, এইভাবে গ্রুপ থিয়েটার মুভমেণ্টটাই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে না? তুমি চাও, তোমার দলটাও ভেঙে যাক ?

প্রবল অহঙ্কার ও অবজ্ঞার সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে ইন্দ্রনাথ বললো, ভাঙে তো ভাঙুক ! আই ডোন্ট কেয়ার। কেউ যদি ইনসিনসিয়ার হয়, কাজে মন না থাকে, তাকে আমি টলারেট করতে পারবো না। আমি যাদের হাতে ধরে কাজ শেখাই, দরকার হলে তাদের আমি শাস্তিও দেবো !

অন্য সকলের দিকে মুখ তুলে তিনি বললেন, যার ডেডিকেশান নেই, গ্রুপকে যে ভালোবাসে না, কিংবা আমার ব্যবহার যার পছন্দ না হয় সে ইচ্ছে করলেই গ্রুপ ছেড়ে চলে যেতে পারে। নো ওয়ান ইজ ইনডিস্পেনসেব্ল। আমি ভাঙা দল নিয়েই চালাবো।

একটু থেমে, মুখ নীচু করে তিনি আবার বললেন, অবশ্য তোমরা সবাই মিলে জোট বেঁধে আমাকেও গ্রুপ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারো, আমিও ইনডিস্‌পেনসেব্‌ল নই।

দরজার কাছ থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, খাবার এসে গেছে! খাবার এসে গেছে!

তপন হাঁক দিল, রুমা, তুমি আগে খাবারটা নিয়ে নাও!

ইন্দ্রনাথ তখনও খেতে না গিয়ে মঞ্চে চলে এলেন। সেটা সব ঠিকমতন খোলা হয়েছে কি না তার তদারকি করা দরকার। তাঁর মাথার দু'পাশের শিরা দপদপ করছে। জুতোর পেরেক ফোটা পা-টা টনটন করছে খুব, সেপটিক হলো কি না কে জানে!

প্রত্যেক কল শো-তে নিজেদের সেট নিয়ে যেতে হয়। সেট নষ্ট হয়ে গেলেই আবার খরচের ধাক্কা। সেটগুলো বানানোই হয় এমন-ভাবে যাতে চটপট খুলে ফেলা যায়, বা ভাঁজ করা যায়। সব ঠিকঠাক ভরে নিতে হবে বাসে।

শো-এর পর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও ইন্দ্রনাথ একটা নিয়ম করে দিয়েছেন। মফস্বলের কল শো-এর উদ্যোক্তারা খাওয়া নিয়ে অনেক সময় বাড়াবাড়ি করে। মাঝ রাত্রিরে এক গাদা খাবার আনে, দলের ছেলেরাও ক্ষুধার্ত থাকে খুব, লোভের চোটে বেশি বেশি খেয়ে নেয়। পরে অনেকেরই শরীর খারাপ হয়। গ্রুপের অভিনেতা-অভিনেত্রী, এমন কি টেকনিশিয়ানদেরও স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করতে হয় পরিচালককে। তাই ইন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়েছেন, মফঃস্বলে এসে শো-এর পর মাঝরাত্তিরে বিরিয়ানি-পোলাও কিংবা কব্জী ডুবিয়ে মাংস ভাত আর গাদা গুচ্ছের সন্দেশ-রসগোল্লা গেলা চলবে না। লাইট ফুড খাওয়া উচিত। সবচেয়ে ভালো হয় প্যাকেট-ডিনার দিলে। কিন্তু উদ্যোক্তারাই এ নির্দেশ মানতে চায় না। মফস্বলের লোকদের ধারণা, পাত পেড়ে না খাওয়ালে অতিথি পরায়নতাই দেখানো হয় না।

তপন এসে বললো, ইন্দ্রদা, সবাই খাবার নিয়ে বসে আছে, আপনি

না গেলে খেতে পারছে না।

সবাইকে এক ঘরে বসানো যায় নি। স্কুলের আলাদা আলাদা ঘরে এক একটা দল বসেছে। একটা ঘরে রীতিমতন হাপুস হুপুস শব্দ শোনা যাচ্ছে। রুমা, তনিমা, রবি, ফিরোজরা অন্য এক ঘরে বেঞ্চের ওপর খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে ইন্দ্রনাথের জন্য।

উদ্যোক্তাদের যিনি প্রধান, তিনি এখানকার একটি হোটেলের মালিক। এক গাল হেসে বললেন, স্যার, আজ থিয়েটার একেবারে ফাটিয়েছেন। অডিয়েন্স খুব প্লিজড। সবাই ধরেছে, আপনাদের আবার আসতে হবে। এই শীতকালে আসবেন তো?

ইন্দ্রনাথ বেঞ্চিতে বসে প্রথমে জলের গেলাসটা খালি করলেন। তারপর খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না তোমরা খাও!

হোটেলের মালিক বললেন, সে কি স্যার, আপনাদের জন্য স্পেশাল খাবার, একটু মুখে দিয়ে দেখুন।

রুমা বললো, এই যে খানিক আগে তুমি বলছিলে, তোমার খুব খিদে পেয়েছে।

ইন্দ্রনাথ বললেন, তখন পেয়েছিল, এখন খিদে মরে গেছে।

রুমা বললো, একটু কিছুই খাবে না?

ইন্দ্রনাথ বললেন, না।

রুমা বললো, তা হলে আমিও কিছু খাবো না।

তপন আর ফিরোজ বললো, ইন্দ্রদা, তাহলে আমরাও কেউ কিছু খাবো না কিন্তু।

এই কথায় গলে যাবার পাত্র ইন্দ্রনাথ নন। তিনি উদাসীন ভাবে বললেন, ইচ্ছে না হলে খেয়ো না!

তারপর গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, তপন, বাসটা নাকি গোলমাল করছে? ড্রাইভার কী বললো?

তপন জানালো, গিয়ার ঠিকমতন লাগছে না। একজন মেকানিককে ডাকা হয়েছে, আমাদের স্টার্ট করতে খানিকটা দেরি হবে!

ইন্দ্রনাথ বললেন, কত দেরি হবে? কাল সকাল সাড়ে ন'টায় কলকাতায় আমার জরুরি কাজ আছে, পৌঁছোতেই হবে, মহা ঝামেলা করলো দেখছি!

গোঁয়ারের মতন, অন্যদের শত অনুরোধে কর্ণপাত না করে ইন্দ্রনাথ খাবারের জায়গা ছেড়ে গেলেন বাসের অবস্থা দেখে আসতে।

ফিরে এসে বললেন, এ যা দেখছি. রাত তিন-চারটের আগে কিছুতেই বাসটা রেডি হবে না। আমার দরকারি কাজ আছে, আরও অনেকের তো কাল অফিস আছে। যার যার অফিস না গেলে চলবেই না, তাদের ট্রেনে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আড়াইটের সময় ট্রেন আছে না একটা?

রুমার এখনো খাবারে হাত না দিয়ে বসে আছে।

রুমা বললো, এসো, একটুখানি খেয়ে নাও আগে। বিকেল থেকে কিছু খাওনি!

ইন্দ্রনাথ ধমক দিয়ে বললেন, খাবো না তো বলে দিয়েছি। তপন, তুই জামাল-রবিদের বল ওদের বাসেই ফিরতে হবে, যত দেরিই হোক। মালপত্রের চার্জ ওদের ওপর। যারা ট্রেনে যেতে চায়, আমার সঙ্গে আসুক, আমি এখুনি স্টেশানে চলে যাবো!

শেষ পর্যন্ত এগারোজন ট্রেনে ফিরবে ঠিক হলো। বেশি দূর নয়, স্টেশান এখান থেকে হাঁটা পথ। জামাল-রবিদের সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ রওনা হলেন স্টেশানের দিকে। রুমা-তপনরাও শেষ পর্যন্ত কিছু খায় নি, হোটেলের মালিক ওদের খাবারগুলো প্যাকেট করে দিয়েছে।

সন্ধের পর আর কোনো ট্রেন নেই, একটা দূরপাল্লার ট্রেন থামবে রাত আড়াইটের সময়। স্টেশান একেবারে নিঝুম। কয়েকটা আলো মিটমিট করে জ্বলছে, ভেণ্ডার কুলিরা ঘুমোচ্ছে এখানে সেখানে।

আড়াইটে বাজতে অনেক দেরি আছে।

রুমা-তপনরা অনেক ফাঁকা বেঞ্চে বসার জায়গা পেয়ে গেল। ইন্দ্রনাথ লম্বা পা ফেলে পায়চারি করতে লাগলেন সারা প্লাটফর্ম। কেউ তাঁকে বসতে বলতে সাহস করছে না, জানে যে কিছু বললেই ধাতানি খেতে হবে। ইন্দ্রনাথের মেজাজ এখনো আগুন হয়ে আছে। তাঁর হাতে একটা টর্চ। সেটা আপন মনে একবার জ্বালাচ্ছেন, একবার নেবাচ্ছেন।

আসার পথে রুমা শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি একটু খোঁড়াচ্ছো মনে হচ্ছে? পায়ে কী হয়েছে?

ইন্দ্রনাথ চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন, কিচ্ছু হয় নি। হবে আবার কী! পরের শো-তে রাজার ভূমিকায় আমি খোঁড়াবো ঠিক করেছি, তাতে আর একটা এফেক্ট আসবে। সেই খোঁড়ানোটা প্র্যাকটিস করছি।

ইন্দ্রনাথকে এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্লাটফর্মে পায়চারি করতে দেখে রুমা-তপনরা বলাবলি করছে, পরের শো-এর জন্য ইন্দ্রদা সত্যিই এখন খোঁড়ানো প্র্যাকটিস করছে? এটা এক ধরনের পাগলামি না নিষ্ঠা?

প্ল্যাটফর্মের বাইরে একটা গাছের নীচে অন্ধকার বেঞ্চে বসে আছে একজন মানুষ। সে হরষিত। ইন্দ্রনাথ এক সময় ক্লান্ত হয়ে সেই বেঞ্চটায় এসে বসলেন। তিনি হরষিতকে চিনতে পেরেই সেখানে বসলেন, কিংবা না জেনে, তা ঠিক বোঝা গেল না।

তিনি অবশ্য একটাও কথা বললেন না হরষিতের সঙ্গে। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানতে লাগলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে তপন সেখানে এসে দাঁড়ালো।

শো-এর সময় খুব জরুরি মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল হরষিত, কিন্তু এখন তার চোখ খোলা। সেও টেনে যাচ্ছে একটার পর একটা সিগারেট।

তপন বললো এই হরষিত, তুই তো কিছু খেয়ে আসিস নি? খিদে

পেয়েছে নিশ্চয়ই।

হরষিত কোনো উত্তর দিল না।

তপন বললো, খাসনি বলে ইন্দ্রদাও একটুও মুখে দেয় নি। আমরাও খাইনি। প্যাকেট এনেছি, একটু খেয়ে নে।

তপন একটা প্যাকেট রাখলো হরষিতের কোলে। হরষিত সঙ্গে সঙ্গে সেটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল লাইনের ওপর।

তপন বললো এখনো তোর রাগ যায় নি। তোর জন্য আজ ইন্দ্রদাকে কত বকুনি দিয়েছি, তা জানিস? ইন্দ্রদা আমাদের যদি মাথা গরম করে কিছু বলেই ফেলে তাহলে…

ইন্দ্রনাথ দাপটের সঙ্গে ধমকে উঠলেন, শাট আপ! কেন বকবক করে আমাকে এখানে ডিসটার্ব করতে এসেছিস। যা ভাগ!

তপন এক পা এক-পা করে পিছু হটে গেল। সে বুঝেছে, এখনো এই আগ্নেয়গিরিতে জল ঢালা যাবে না।

এরপর আবার সবাই চুপচাপ।

রেল স্টেশান বলতেই একটা ব্যস্ততা, হুড়োহুড়ির ছবি ফুটে ওঠে, তাই সেখানকার নির্জনতা, নীরবতাকেও বেশি বেশি মনে হয়। একটা শুকনো পাতা খরখর করে উড়ে যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে সেই শব্দটাও। দূরে জ্বলছে সিগনালের লাল আলো।

বসে থাকতে থাকতে রুমা-তপনদের ঢুলুনি এসে গেল। একটা পুরো খালি বেঞ্চ পেয়ে শুয়ে পড়েছে সুকুমার। বাতাস এখন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে।

হরষিতের চোখে এক ফোঁটাও ঘুম নেই। ইন্দ্রনাথের জেগে থাকা বোঝা যায় তার হাতের জলন্ত সিগারেট দেখে। পরস্পরের দিকে একবারও তাকায়নি ওরা। হরষিত প্রতিমুহূর্তে উৎকর্ণ হয়ে আছে, ইন্দ্রনাথ তাকে কিছু বলবেন। কিন্তু ইন্দ্রনাথ সে ধাতুতে গড়াই নন। তাঁর মুখখানি কঠোর হয়ে আছে।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। কোনো কথা নেই, কোনো

শব্দ নেই।

ইন্দ্রনাথের উপস্থিতি, তার শরীর থেকে নির্গত তরঙ্গ যেন এক-সময় আর সহ্য করতে পারলো না হরষিত। সে উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল দু'পা। তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কান্না চাপবার জন্য সে মুখ ঢাকলো দু'হাতে।

ইন্দ্রনাথ সচকিত হয়ে সেদিকে তাকালেন। তাঁর মুখ থেকে মিলিয়ে গেল কঠোর রেখা। যেন বেশ অবাক হয়েছেন।

তারপর আজ সারা সন্ধের পর এই প্রথম মৃদু হেসে বললেন, এই তো, এইবার ঠিক হয়েছে। লাস্ট সিনে ঘাতকের কান্না ঠিক এই রকম হবে।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি হরষিতের ঘাড় ধরে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, স্টেজে এই কান্নাটা বেরোয় না কেন, স্টুপিড? আর একবার দেখা! আমি মাটিতে পড়ে যাচ্ছি! মুখটা ঢাকবি না, তাতে চোখের এক্স-প্রেশান দেখা যায় না!

ইন্দ্রনাথ সত্যি সত্যি নিহত হবার ভঙ্গিতে দড়াম করে পড়ে গেলেন মাটিতে।

হরষিত কান্না থামাতে পারেনি এখনো, যদিও বিস্ময়ে তার মুখটা হাঁ হয়ে গেছে!

ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বেঞ্চ থেকে টর্চটা নিয়ে এসে হরষিতের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, মনে কর, এটা তোর ছোরা। এটা দিয়ে আমার বুকে মার। আমি মাটিতে পড়ে যাবার পর ঠিক দশ গুনবি, তারপর কান্না শুরু করবি!

হরষিতের হাতটা ধরে উঁচু করে ইন্দ্রনাথ বললেন, ছোরা চালিয়ে দে!

যন্ত্রচালিতের মতন হরষিত টর্চ দিয়ে ইন্দ্রনাথের বুকে একটা খোঁচা মারলো। ইন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লেন মাটিতে।

ফের উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কান্নাটা প্রথমে আস্তে হবে, তারপর

জোরে। তুই দশ পর্যন্ত গুনিস নি, আগেই কাঁদতে শুরু করলি কেন? নে, আবার টর্চটা ধর ঠিক করে।

অন্যরা সবাই জেগে উঠেছে। রুমা কাছে এসে বললো, এরপর আমার যে ডায়ালগ আছে সেটাও বললো?

তপন বললো, ইন্দ্রদা, ক্রাউড সিনে আমার ডায়ালগটা বাদ গেছে, সেখান থেকেই শুরু হোক তা হলে।

সুকুমার, জয়শ্রী, তনিমারা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে খলখল করে হেসে, হাততালি দিতে দিতে বললো, হয়ে যাক, পুরো লাস্ট সিনের রিহার্সালটা এখানে একবার হয়ে যাক!

ছাদ

বাড়ি। একটা নিজের বাড়ি!

সুমিতের ঠাকুর্দার একটা নিজস্ব বাড়ি ছিল বটে, কিন্তু তার বাবার কোনো বাড়ি ছিল না। বাবার আমল থেকেই ওরা শিকড়হীন, স্রোতের শ্যাওলার মতন কলকাতার নানান পাড়ায় ভাড়াটে হিসেবে কাটিয়েছে। ঠাকুর্দার বাড়িটা অবশ্য বিক্রি করা হয়নি, সেটা হারিয়ে গেছে র‍্যাড-ক্লিফির ছুরিতে।

কোনো ভাড়া বাড়িই মায়ের পছন্দ হতো না। প্রথম দিকে তো থাকতে হয়েছিল উত্তর কলকাতার তেলীপড়া লেনে, একতলায় মাত্র দেড়খানা ঘর। দিনের বেলাতেও ঘরের মধ্যে অন্ধকার। সে বাড়িটা ছিল পাখির বাসার মতন। মাত্র দোতলা বাড়ি, তাতেই পাঁচটা ভাড়াটের সংসার, সব সময় মানুষের কলকোলাহল। সুমিত খুব ছোট ছিল, তার মনে আছে, জল নিয়ে প্রত্যেকদিন ঝগড়া হতো, মেয়েরা গামছা পরে দাঁড়িয়ে থাকতো বাথরুমের বাইরে। বাথরুম না, ওরা বলতো কলঘর। চৌবাচ্চার ভেতরটায় ময়লা জমে জমে এমনই অবস্থা যে জলের রং-ও কালো মনে হতো।

মা প্রায়ই বলতেন, ভাড়া বাড়িতে থাকলে মন ছোট হয়ে যায়। ছেলে-মেয়েরাও যদি জল নিয়ে ঝগড়া করতে শেখে, তবে তারা এক সময় ভুলেই যাবে যে তারা একটা ভদ্র বংশে জন্মেছিল।

বাবাকে এ জন্য প্রায়ই গঞ্জনা শুনতে হতো। মা চাইতেন, খাওয়ার কষ্ট হয় হোক, জামা-কাপড় ছেঁড়া পরলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু একটা বাড়িতে থাকতে হবে। কিন্তু তখন কোনোরকম শৌখিনতার কোনো প্রশ্নই ছিল না। বাবার তবু একটা চাকরি ছিল, কিন্তু জ্যাঠামশাই সপরিবারে ওপার থেকে চলে এসেছিলেন, কোনো উপার্জনই ছিল না

তাঁর। সেই সংসারের খরচও বাবাকে টানতে হতো। সুমিতের জ্যাঠাইমা আর তার মা, এই দুই জায়ের মধ্যে ভাব ছিল না কখনো। দেশের বাড়িতে জ্যাঠাইমা-ই ছিলেন কর্ত্রী, মাকে খুব দাবিয়ে রাখতেন। সেই জ্যাঠাইমা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কলকাতায় এসে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন, ছোট জায়ের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মা এটা সহ্য করতে পারতেন না। আগেকার দুর্ব্যবহারের শোধ তুলতেন যখন তখন। শেষ পর্যন্ত জ্যাঠামশাইরা উঠে গিয়েছিলেন গোয়াবাগানের এক বস্তিতে। বাবা অবশ্য নিজের দাদাকে ফেলতে পারেননি। প্রত্যেক মাসে তাঁর মাইনের অর্ধেক তুলে দিয়ে আসতেন জ্যাঠামশাইয়ের হাতে।

সেইসব দিনের কথা সুমিতের ইদানীং বেশি করে মনে পড়ছে।

বছর দশ-পনেরো বাদে অবস্থা কিছুটা ফিরেছিল। সুমিতের দিদি অর্চনা গ্র্যাজুয়েট হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে যায়। ব্যাঙ্কের চাকরির মাইনে ভালো, বাবা এতদিন ধরে সরকারি কোম্পানির চাকরি করছেন, আর নতুন চাকরিতে ঢুকেই দিদির মাইনে প্রায় তাঁর সমান। বিয়ের আগে টানা পাঁচ বছর দিদি তার মাইনের টাকা দিয়ে এই সংসারের সাহায্য করে গেছে।

সেই সময়টায় ভবানীপুরের একটা তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাটে উঠে আসা হয়েছিল। বেশ ভালো বাড়ি, জলের কোনো অসুবিধে নেই, তবু মায়ের পছন্দ হয়নি। বাড়িওয়ালারাও থাকতো ঐ বাড়ির তিনতলায়। ভাড়াটেদের সঙ্গে বাড়িওয়ালাদের ব্যবহারের মধ্যে কখনো সূক্ষ্মভাবে জমিদার-প্রজার সম্পর্কের মতন একটা ভাব ফুটে বেরোয়ই। পরের বাড়িতে থাকাটাই মা মেনে নিতে পারতেন না।

দিদির বিয়ের পর বিপর্যয় এলো দু'রকম ভাবে।

অর্চনা অবশ্য বিয়ে করেছে নিজে পছন্দ করে, তার বিয়েতে পণ-টণ কিংবা বেশি গয়নাগাটি দেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। তবু মেয়ের বিয়েতে কয়েক হাজার টাকা তো খরচ হয়ই। অনেক কষ্টে বাবা সেই টাকা

সংগ্রহ করেছিলেন। প্রতি মাসে কিছু ঋণ শোধের ব্যাপার ছিল। সংসার থেকে দিদির উপার্জনটাও বাদ হয়ে গেল, তখন ভবানীপুরের ঐ বড়ো ফ্লাটটার ভাড়া টাকাও কষ্টকর মনে হতো।

অর্চনা বিয়ের পরেও চাকরি ছাড়েনি এবং সে তার মাইনের খানিকটা অংশ অন্তত বাপের বাড়ির জন্য দিতে চেয়েছিল। মা সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির কাছে কিছুতেই তিনি ছোট হতে পারবেন না!

এরই মধ্যে মা আবার একটি জেদ ধরলেন।

পাশের ফ্ল্যাটের এক মহিলার কাছ থেকে জানা গেল যে বারুইপুরে খুব সস্তায় জমি বিক্রি হচ্ছে। সেই মহিলারা সেখানে এক বিঘে জমি কিনেছেন, সেখানে একটা বাড়ি বানিয়ে তাঁরা শিগগির উঠে যাবেন।

মা অমনি ধরে বসলেন, বাবাকেও ওখানে জমি কিনতে হবে!

একেবারে অসম্ভব প্রস্তাব, বাবার হাতে কোনো টাকাই নেই, বরং রয়েছে ধার। এখন জমি কেনা নিছক দিবা স্বপ্নেই সম্ভব।

মা তবু বেঁকে বসে রইলেন, কান্নাকাটি করলেন, শেষ পর্যন্ত বারকরে দিলেন তার গয়না। এতদিনের অভাব আর টানাটানির মধ্যেও কী করে ঐ গয়না বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তা কে জানে। সেই গয়না বিক্রি করে বারুইপুরের কাছে কেনা হলো সাড়ে চার কাঠা জমি। বেশ সস্তাই বলতে হবে, তিন হাজার টাকা করে কাঠা। কলকাতার মধ্যে জমির দাম আগুন, মধ্যবিত্তরা দ্রুত সরে যাচ্ছে মফঃস্বলের দিকে!

জমি কেনার পরেই মায়ের মেজাজ বেশ প্রসন্ন হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি না থাক, তবু তো এক টুকরো জমির মালিক। পশ্চিমবাংলায় নিজস্ব একটা পা রাখার জায়গা।

ঠিক হলো, বাবার ধার-টার একটু শোধ হলেই ভিত খুঁড়তে হবে ঐ জমিতে। কোনোরকমে একটা ঘর হলেই চলবে সঙ্গে রান্নাঘর আর বাথরুম। মা তাতেই রাজি, কোনোক্রমে সেই একখানা ঘরে মাথা গুঁজে থাকতে পারলে মাঝে মাঝে বাড়ি ভাড়ার টাকাটা বাঁচানো যাবে,

সেই টাকা সাশ্রয় হলে বাড়ানো যাবে আরও দু'একটা ঘর। আস্তে আস্তে হবে, তাতে ক্ষতি কি।

সুমিতের তখন পনেরো বছর বয়েস। সবেমাত্র কবিতা লিখতে শুরু করেছে। সে দেখতো, মাঝে মাঝেই রাত্তিরের দিকে বাবা আর মা তাঁদের কাল্পনিক বাড়ির নক্সা নিয়ে আলোচনা করছেন। কাল্পনিক বাড়িটি দোতলা, তার ঘরগুলির আকার ও অবস্থান বদলে যাচ্ছে অনবরত। বাবা ওপরের দিকে আঙুল তুলে বলতেন, দোতলার বড়ো ঘরটা হবে ঐ ডানদিকে। মা-ও আঙুল তুলে বলতেন, ডানদিকে তো একটা কারখানা দেখা যাবে, বরং পুবদিকটায় একটা পুকুর আছে···।

হঠাৎ এক সন্ধেবেলা বাবার হৃদযন্ত্রটি বন্ধ হয়ে গেল। তখনও তাঁর রিটায়ার করার পাঁচ বছর বাকি। নিজের বাড়ি আর দেখা হলো না। বাবাকে এই পৃথিবীটাই ছাড়তে হলো।

এরপর আর বাড়ি বানাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। প্রায় আট-ন'বছর অনেক ঝড়-ঝাপটার মধ্যে কেটেছে। মাঝে মাঝে বারুইপুরের জমিটা বিক্রি করে দেবার কথা উঠতো, সুমিতই তখন এ সংসারের প্রধান পুরুষ, সে বলতো, এখন থাক জমিটা। এর থেকেও যদি খারাপ অবস্থা হয় কখনো....।

সুমিত চাকরি পাবার পর অবস্থা কিছুটা সামলালো। আর তিন বছরের মধ্যেই তার ছোট ভাই অমিত চাকরি পেল বম্বেতে। মাকে সে নিয়ে গেল তার কাছে। দু'বছর পর অমিত চলে গেল ক্যানাডায়। মা ফিরে এলেন সুমিতের কাছে। অর্চনা তার স্বামীর সঙ্গে থাকে কানপুরে, সে হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার ছেলে-মেয়েদের সামলাবার জন্য মাকে সেখানে গিয়ে থাকতে হলো টানা আট মাস।

অফিস থেকে সুমিত এখন ভালো ফ্ল্যাট পেয়েছে বালিগঞ্জ প্লেসে। চব্বিশ ঘণ্টা জল, প্রচুর আলো-হাওয়া। বড়ো বড়ো তিনটে বেড রুম, তাছাড়া লিভিং রুম ডাইনিং স্পেস। দুটো বারান্দা। মায়ের একটা ঘর আলাদা করে রাখা আছে। বারুইপুরের জমিটা পড়ে আছে,

তা নিয়ে সুমিত মাথা ঘামায় না।

মা-ও আর কক্ষনো বাড়ির কথা বলেননি। একবারও না।

মাঝে মাঝে শোনা যায়, খালি জমি ফেলে রাখলে জবর দখল হয়ে যেতে পারে। জমির দাম বারুইপুরেও অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু সুমিত তার অফিস এবং লেখালেখি নিয়ে এতই ব্যস্ত যে ওসব নিয়ে চিন্তা করারও সময় পায় না।

সুমিতের স্ত্রী রূপালি অবশ্য মাঝে মাঝে জমিটা দেখতে যায়। গত বছর সে জমিটার একটা ভালো ব্যবস্থাও করেছে। রূপালির খুব গাছপালার শখ, সে অনেকগুলো গাছের চারা লাগিয়ে এসেছে সেই জমিতে। বাড়ি না হোক, ঐ জমির ফুল-ফল উপভোগ করা যাবে।

গাছ লাগালেই গাছ বড়ো হয় না। জমির চারপাশে বেড়া লাগাতে হয়। নিয়মিত গাছে জল দেবার ব্যবস্থা করাও দরকার। রূপালি নিজের উদ্যোগেই রাধেশ্যাম নামে স্থানীয় একজন লোককে ঠিক করে এসেছে! সে নিয়মিত গাছে জল দেবে, বাগান দেখবে। মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে। রূপালি নিজেও দেখাশুনো করবার জন্য নিজেও প্রায়ই যায় সেখানে, মাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মা গড়িমসি করেন, তাঁর কোনো আগ্রহ নেই মনে হয়।

অমিত তিন বছর অন্তর একবার ক্যানাডা থেকে দেশে ফেরে। খুব হৈ চৈ করে কয়েকটা দিন খরচ করে দু'হাতে। প্রত্যেকবার এসেই সে মাকে নিয়ে যেতে চায় ক্যানাডায়, কিন্তু মা সাগর পাড়ি দিতে একেবারেই রাজি নন।

এবারে অমিত এসে বৌদির সঙ্গে একদিন জমিটা দেখতে গিয়েছিল। চারা গাছগুলো এখনো ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়নি, তবে বেঁচে গেছে কিছু কিছু। রাধেশ্যাম নামে লোকটি তেমন যত্ন নেয়নি; গরু-ছাগল ঢুকে খেয়ে ফেলেছে কিছু গাছ। অমিত তাকে বকুনি দিয়েছে আবার একটা ঘড়িও উপহার দিয়ে এসেছে।

অমিত হঠাৎ বললো, দাদা, জায়গাটা এমনি এমনি পড়ে আছে।

ওখানে একটা বাড়ি বানিয়ে ফেললেই তো হয়। তুই একটা এস্টিমেট করে ফ্যাল, আমি আর্দ্ধেক টাকা দিচ্ছি।

সুমিত বললো, তোর মাথা খারাপ নাকি? ওখানে বাড়ি বানিয়ে কী হবে? কে থাকবে? আমি কি এই ফ্ল্যাট ছেড়ে ঐ ধ্যাদ্ধারা গোবিন্দপুরে থাকতে যাবো নাকি?

অমিত বললো, তবু একটা নিজেদের বাড়ি থাকবে! আমি যখন দেশে আসবো, তখন ঐ রকম একটা ফাঁকা জায়গায় থাকতে ভালো লাগবে। কলকাতার বাতাসে আমার চোখ জ্বালা করে।

সুমিত হেসে বললো, তুই তিন-চার বছর অন্তর আসবি, তার জন্যে একটা বাড়ি করে ফেলে রাখতে হবে? ভাড়া দিলেও রিস্কি, একবার দিলে আর ভাড়াটে উঠবে না!

অমিত বললো, ভাড়া দিতে হবে কেন? মা গিয়ে থাকতে পারে।

এই একটা অবশ্য সুমিত উড়িয়ে দিতে পারলো না।

মা আজকাল খুব কম কথা বলেন। তা শুধু বয়সের জন্যই না। মায়ের কোনো নিজস্ব সংসার নেই। কখনো অর্চনার কাছে, কখনো বড়ো নাতির কাছে জামসেদপুরে, কখনো থাকেন সুমিতের বাড়িতে। এ বাড়িতে রূপালিই এখন গৃহিণী, মা-ও পরিবারিক ব্যাপারে বিশেষ মাথা গলান না।

বারুইপুরে একটা বাড়ি করলে মা সেখানে আবার একটা সংসার পাততে পারেন।

অমিত বেশি উৎসাহ দেখিয়ে বললো, আমি কিছু টাকা রেখে যাচ্ছি, তুই এক্ষুণি কাজ সুরু করে দে দাদা!

সুমিত বললো, টাকা দিলেই হলো? বাড়ি তৈরির ঝঞ্ঝাট আছে না? কণ্ট্রাক্টরকে দিয়েও নিজেরা দাঁড়িয়ে না দেখলে চুরি করে ফাঁকা করে দেবে। আমার একদম সময় নেই।

রূপালি ফস করে বললো, আমি দেখাশুনো করতে পারি।

দেখা গেল একটা নতুন বাড়ির ব্যাপারে রূপালিরও খুব উৎসাহ।

দেওর আর বৌদি মিলে শুরু হয়ে গেল জল্পনা কল্পনা।

এক সময় অমিত বললো, দাদা, তোমার চেনা কোনো আর্কিটেক্ট আছে তাহলে একটা প্ল্যান করিয়ে ফেললে হয়। আমি যাবার আগেই দেখে যেতে চাই।

তখন অনেকদিন আগেকার একটা দৃশ্য মনে পড়লো সুমিতের। সে একটুক্ষণ দেয়াল দেখলো। রাত্তিরবেলা মা আর বাবা আঙুল তুলে তুলে একটা কাল্পনিক দোতলা বাড়ির ছবি আঁকতেন। অমিত তখন বেশ ছোট, সে এসব জানে না।

মা এ-ঘরে এলে সুমিত জিজ্ঞেস করলো, মা তোমার মনে আছে, তুমি আর বাবা মিলে একটা বাড়ির নক্সা বানিয়েছিলে? সেটা তোমরা এঁকে রেখেছিলে কোথাও!

মা উদাসীন ভাবে বললেন, সে কি আর মনে আছে। কতদিন আগেকার কথা!

অমিত বললো, মা, বাবার জায়গাটায় আমরা এবার একটা বাড়ি বানাবো ঠিক করেছি।

মা বললেন, শুধু শুধু পয়সা খরচ করে ওখানে বাড়ি বানিয়ে কি করবি? কে থাকবে?

অমিত বললো, আমরা সবাই যখন ইচ্ছে থাকবো। দিদি কলকাতায় এলে থাকতে পারে। তুমি থাকবে!

মা তবু বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। কখন তিনি উঠে গেলেন তা আমরা খেয়ালও করলাম না।

একটু পরে রুপালি ফিসফিস করে বললো, এই, মায়ের কী যেন হয়েছে। বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। আমি দু' তিনবার ডাকলুম। কোনো উত্তরই দিলেন না!

অমিত অবাক হয়ে বললো, কেন, মা কাঁদছে কেন? এই তো এখানে ছিল!

অমিত খুব ছোট ছিল, তার সেইসব দুঃখের দিনগুলোর কথা মনে

নেই। মা যে তাঁর শেষ গয়নাগুলো বিক্রি করতে দিয়েছিলেন জমিটা কেনার জন্য, সে কথাও বোধহয় অমিত জানে না।

সুমিতের সব মনে পড়ে যায়। মায়ের কান্নার কারণটাও সে আন্দাজ করতে পারলো। স্বামীকে তিনি বাড়ি তৈরি করবার জন্য জোর করতে পারতেন, ছেলেদের পারেন না। ইচ্ছেটা মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন এতদিন, কিন্তু এখন তাঁর বাড়ির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

সুমিত গল্প-উপন্যাস লেখে, তাতে অনেক মাতৃচরিত্র থাকে। কিন্তু নিজের মায়ের সঙ্গে তার যোগসূত্রটা ক্ষীণ হয়ে গেছে। আগের মতন সে মায়ের সামনে বসে প্রাণ খুলে গল্প করতে পারে না।

অমিত থাকে বিদেশে, মায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় খুব কম, তবু মায়ের সঙ্গে তারই বেশি বন্ধুত্ব। সে পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো মাকে।

অমিতের উৎসাহেই দু' সপ্তাহের মধ্যে একটা বাড়ির নীল-নক্সা তৈরি হয়ে গেল। অমিতের ফেরার দু' দিন আগে ভিত, পুজো হয়ে গেল পর্যন্ত। ডলার ভাঙিয়ে গুচ্ছের টাকা সে রেখে গেল বৌদির কাছে।

রূপালির প্রধান নেশা রবীন্দ্রসঙ্গীত। সে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছে অনেকদিন, মাঝে দু' একটা অনুষ্ঠানে মঞ্চে বসেও গান গায়, বাড়িতে সর্বক্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট বাজে। তার যে বাড়ির তৈরির ব্যাপারেও এত আগ্রহ থাকতে পারে, তা সুমিত আগে কখনো বুঝতে পারেনি। প্রত্যেক নারীর মধ্যেই বুঝি একটা নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা থাকে।

সুমিত নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তবু তাকে প্রত্যেকদিনই এখন ইট, সিমেণ্ট, বালির কথা শুনতে হয়। রূপালি তার এক মাসতুতো ভাইয়ের সাহায্য নিচ্ছে, ওরা দু'জনে মিলে মিস্তিরিদের কাজ তদারক করতে যায় প্রায় প্রত্যেকদিনই। বাড়ি ফিরে সেই সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। যে-সব মিস্তিরিদের চোখেও দেখেনি সুমিত,

তাদের নাম এখন তার মুখস্থ। কোন্ মিস্তিরি ফাঁকিবাজ আর কে খুব ভালো কাজ জানে অথচ প্রায়ই ডুব মারে, তাও সুমিত জানে। রাধে-শ্যাম নামে যে-লোকটিকে গাছে জল দেবার জন্য রাখা হয়েছিল, সে আর তার স্ত্রী সুবালা খুব গোলমাল করছে। কাজ কিছু করে না, কিন্তু প্রায়ই এটা সেটা চায়, তাদের ছেলে মেয়েরা এসে ঘুর ঘুর করে। রূপালিকে এর মধ্যেই দু'খানা শাড়ি ও বাচ্চাদের জন্য কয়েকটা প্যান্ট শার্ট দিতে হয়েছে। ওদের ছাড়ানোও যাচ্ছে না, এমন নাছোড়বান্দা!

ছোট ভাই টাকা দিয়ে গেছে, সেইজন্য সুমিতকেও এখন টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে। কিন্তু শুধু দিয়েও তো তার নিষ্কৃতি নেই, ইট সিমেন্টের কথা শুনতে শুনতেও তার কান ঝালাপালা হয়। বাড়ির প্ল্যানও বদলাচ্ছে ঘন ঘন, রূপালি এখন মাকেও যুক্ত করে নিয়েছে।

কয়েক মাস বাদে রূপালি একদিন বললো, এই শোনো, সামনের রবিবার কিন্তু তুমি কোনো কাজ রাখবে না। সেদিন তোমাকে বাড়ির ওখানে যেতে হবে!

সুমিত আঁতকে উঠে বললো, সে কি, এর মধ্যে বাড়ি তৈরি হয়ে গেল নাকি? কমপ্লিট?

রূপালি বললো, ধ্যাৎ; তুমি কিছু বোঝো না। বাড়িটা কি আলাদিন বানাচ্ছে নাকি? এত তাড়াতাড়ি বাড়ি হয়? জানলা-দরজার এখনো অর্ডার দিয়েছি?

সুমিত বললো, তা হলে আমি এখন গিয়ে কী করবো?

রূপালি বললো, সেদিন ছাদ ঢালাই হবে।

সুমিত বললো, তুমিই তো বললে আমি বাড়ির কাজ কিছু বুঝি না। ছাদ ঢালাইয়ের সময় গিয়েই বা কী করবো? সে তো শুনেছি অনেকক্ষণ লাগে!

রূপালি বললো, ছাদ ঢালাইয়ের সময় থাকতে হয়। মিস্তিরিদের মিষ্টি খাওয়াতে হয় সেদিন, বাড়ির লোকজন সেদিন না থাকলে চলে?

সুমিত হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও রূপালি জেদ ধরে

রইলো। শেষ পর্যন্ত অভিমান করে বললো, বাড়ির জন্য আমি খেটে মরছি, গায়ের রং কালো হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি একদিনও যেতে পারবে না। টাকা দিয়েই সব দায়িত্ব শেষ?

শনিবার রাত্তিরে খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল এক চোট। রবিবার সকালেও আকাশ মেঘলা। এসবই নাকি ভালো লক্ষণ। বিকেলের আগে ঢালাই শেষ হবে, তারপর বৃষ্টি নামলে ছাদ মজবুত হবে। সিমেণ্ট ঢালাই দশ-পনেরো দিন এমনিতেই জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়।

সুমিত আর রূপালি যখন পৌঁছলো, তার আগেই ঢালায়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে। রূপালির ভাই বিমল তদারকি করছে সব কিছুর। সিমেণ্ট আর বালি মিশ্রণের পরিমাণ বিষয়ে তার টনটনে জ্ঞান আছে। বালিগুলো চালুনি দিয়ে ছেঁকে নেবার নির্দেশ দিচ্ছে সে মিস্তিরিদের।

আজ এক সঙ্গে বেশ কয়েকজন মিস্তিরি ও জোগাড়ে এসেছে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। তলা থেকে তরল ঢালাইয়ের জিনিস ভরা পাত্র বাঁশের ভারা দিয়ে হাতে হাতে উঠে যাচ্ছে ওপরে। এরকমই চলতে লাগলো। একঘেয়ে ব্যাপার।

এখানে সুমিত কী করবে?

একটা বারান্দা তৈরি হয়ে গেছে আগেই, খোলসটা খানিকটা সাফ-সুতরো করে সুমিত বসে বসে সিগারেট টানতে লাগলো।

একটা অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে ঠিকই। ভাড়া বাড়ি নয়, নিজস্ব বাড়ি, এতদিন পর। মাঝখানে কত কিছু ঘটে গেল! জমি কেনার সময়কার দিনগুলি বারবার মনে পড়েছে সুমিতের। বাবার অনেক আপত্তি ছিল, মায়ের গয়না বিক্রি করতে চাননি কিছুতেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জমিটা কেনা হলো, বাবা সত্যিই খুশি হয়েছিলেন খুব। আনন্দ চেপে রাখতে পারলেন না। জমি কেনার পর বাড়ি বানাবার স্বপ্ন দেখতেও শুরু করেছিলেন।

বাবা কষ্টই করে গেলেন সারাটা জীবন, কিছু উপভোগ করার সুযোগ পেলেন না। আজ তাঁর ছোট ছেলে ক্যানাডার বহু টাকা

রোজগার করে, বড়ো ছেলেও মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। সেই সময় যদি একখানা ঘরেরও বাড়ি বানানো যেত, তাহলে যে তৃপ্তি ও সুখ পাওয়া যেত, তার সঙ্গে এখানকার অবস্থাটার তুলনাই হয় না।

একজন স্ত্রীলোক মাথায় আধ ঘোমটা টেনে সুমিতের সামনে এসে দাঁড়িয়ে নোখ খুঁটতে খুঁটতে বললো, দাদাবাবু, একটা কথা বলবো ?

সুমিত অসহায় বোধ করলো। এ আবার কী বলতে চায়? বাড়ির কোনো জিনিসপত্র যদি লাগে, সে ব্যাপারে সে কিছুই বলতে পারবে না। সে ডাকলো, রূপালি, বিমল···

স্ত্রীলোকটি বললো, বৌদিকে আগে বলেছি···আপনি যদি একটু শোনেন···আমার এই জমির গাছে জল দিই, আমার নাম সুবালা।

আগে দেখেনি একে সুমিত, তবু এই চরিত্রটি তার চেনা। রাধেশ্যামের বউ, এর পরনের শাড়িটা বেশ চেনা লাগছে। বোধহয় রূপালিই দিয়েছে।

সুমিত তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

স্ত্রীলোকটি বললো, ঝড়ে আমাদের ঘরের ছাদ উড়ে গেছে। যদি কিছু সাহায্য দেন আমাদের। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আছে।

সুমিত ঠিক যেন শুনতে পায়নি, জিজ্ঞেস করলো, কী বললে ?

স্ত্রীলোকটি বললো, আমাদের ঘরের ছাদ উড়ে গেছে, দাদাবাবু ?

এখনও কথাটা বিশ্বাস হলো না সুমিতের। এটা কি গল্প নাকি ? তার নিজের বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে, বিকেলের মধ্যেই পাকা ছাদ তৈরি হয়ে যাবে আর ঠিক এই সময় একজন বলছে, তার বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে।

এটা বড্ড অতি নাটকীয়। এরকম বিষয়বস্তু নিয়ে সুমিত নিজে কখনো গল্প লিখবে না। প্যাচপেচে, সেন্টিমেণ্টাল ব্যাপার।

ঠিক এই সময় রূপালি এসে উপস্থিত। সে বললো, কী হয়েছে, সুবালা ?

সুবালা খানিকটা কুঁকড়ে গিয়ে বললো, দাদাবাবুকে আমাদের

ঘরটার কথা বলছিলুম।

রূপালি ধমক দিয়ে বললো, তোমাকে দিলাম যে পঞ্চাশ টাকা!

সুবালা বললো, ওতে হবে না। যদি আর কিছু দেন।

রূপালি বললো, ছ্যাখো, এই সময় আমাদের অনেক খরচ। আমরা আর দিতে পারবো না। তোমরা অন্য জায়গা থেকে জোগাড় করো!

সুবালা চলে যাবার পর সুমিত জিজ্ঞেস করলো, সত্যি সত্যি ওদের ছাদ উড়ে গেছে? নাকি বানিয়ে বলছে?

রূপালি বললো, না, বানায় নি। এই কাছেই ওরা থাকে, মাটির ঘর একখানা, তার ওপর খড়ের চাল উড়ে গেছে কালকের ঝড়ে। আমি দেখে এলুম তো। কিন্তু আমরা আর কত দেবো? ওর স্বামীটা একটা অপদার্থ!

সুমিতের ইচ্ছে করলো হো-হো করে হেসে উঠতে! তাহলে এরকম সত্যিই ঘটে। একজনের ছাদ ঢালায়ের পাশে আর একজনের ঘরের ছাদ উড়ে যায়! একজন কিছু পেলেই আর একজনকে কিছু হারাতে হবে!

আশেপাশে আরও কিছু পাকা বাড়ি উঠেছে। কিছু খালি জমিও আছে। পেছন দিকে খানিকটা দূরে বোধহয় জবর দখলের জমি, সেখানে এলোমেলো ভাবে কয়েকটা মাটির বাড়ি। তারই একটা সুবালাদের।

কোনো কাজ নেই, সুমিত হাঁটতে হাঁটতে গেল সেই দিকটায়। কারুর বাড়ির ছাদ যদি ঝড়ে উড়ে তার জন্য ঝড় দায়ী, সেই খরচ রূপালি বহন করতে যাবে কেন? খড়ের ছাউনি দিতে কত লাগে, তাও সুমিত জানে না।

কাছাকাছি গিয়ে সুমিত দেখলো সুবালা আর রাধেশ্যাম ছড়ানো-খড়গুলো জড়ো করছে এক জায়গায়। মাটির দেওয়ালও ধসে যায়নি ভাগ্যিস। কয়েকটা বাচ্চা ছুটোছুটি করছে তার মধ্যে। একটি মেয়ে, আর দুটি ছেলে। মেয়েটিই বড়ো, একটা বেখাপ্পা ফ্রক পরে আছে সে,

তার শাড়ি পরার বয়েস এসে গেল বলে।

সুমিত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। তার আবার হাসি পাচ্ছে। গরিবের দুঃখ-কষ্ট দেখে হাসা যায় না, সেটা অমানবিক ব্যাপার। সুমিতের হাসি পাচ্ছে অন্য কারণে। সে একটা আশ্চর্য মিল খুঁজে পাচ্ছে। এরা তিন ভাই বোন, যেন অবিকল সুমিতদের এক সময়কার পারিবারিক ছবি। বড়ো মেয়েটি অর্চনা, তারপর সুমিত আর অমিত।

মাথার ওপর একটা নিজস্ব ছাদ তুলতে এদের এখনো কত দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে!

মাছ

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সুরমা বারান্দায় এলেন কাক তাড়াতে। দুটো কাক অনেকক্ষণ থেকে বিশ্রী সুরে ডেকেই চলেছে। সুরমা এর আগে দু'তিনবার এসে তাড়িয়ে দিয়ে গেছেন, তবু ওরা ফিরে আসে। ওদের কি আর কোনো জায়গা নেই? এই বারান্দায় এসেই ডাকতে হবে? ওরা কী চায়? তারের জাল দিয়ে বারান্দাটা ঢেকে দিলে হয়, কিন্তু বাড়িওয়ালা দেবে না, নিজেদের খরচ করতে হবে। প্রস্তাবটা শুনে প্রতুল হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সুরমার কাকের ডাক সহ্য হয় না, তা বলে কি জালের বাইরে বসে কাক ডাকতে পারে না?

রান্নাঘরের জানলাটা সব সময় মনে করে বন্ধ করে দিতে হয়। একটা হুলো বেড়াল ঢুকে পড়ে যখন তখন হুলো বেড়ালটা মহাচোর, একটু অন্যমনস্ক হলেই মাছ নিয়ে পালাবে। সুরমা রান্নাঘরে থাকলেও সেটা এক এক সময় জানলা দিয়ে বাঘের মতন মুখটা বাড়িয়ে দেয়। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে। মুখে হুস হুস করলেও সে ভয় পায় না। যেন সে বলতে চায়, আমায় কিছু দেবে না কেন? দাও, দাও! ওটাকে তাড়াবার জন্য সুরমা রান্নাঘরে একটা লাঠি রেখেছেন।

সকাল দশটার পর বাড়ি খালি হয়ে যায়। স্বামী অফিসে, দুই ছেলে মেয়ে স্কুলে। ফ্ল্যাটের দরজাটা বন্ধ করে রাখেন সুরমা। এ পাড়ায় খুব ভিখিরি আর ফেরিওয়ালাদের উপদ্রব। বছর খানেক আগে চাঁদা চাইবার নাম করে এক দুপুরবেলা তিনটি ছেলে সেনেদের বাড়ির দোতলায় এসে ডাকাতি করে গিয়েছিল। সেইজন্য সুরমা কক্ষনো দরজা খোলেন না। তবু প্রায় সারা দুপুরই সুরমার ঐ হুলো বেড়াল আর কাকের ভয়ে কাটে। ওরা যে কখন ঢুকে পড়ে কী খাবে, তার ঠিক নেই।

সুরমা খুব কাছে গিয়ে কাক দুটোকে তাড়ালে ওরা উড়ে গিয়ে পাশের বাড়ির ছাদের কার্নিশে বসে। একটু পরেই আবার ফিরে আসে। ওরা কি অন্য কোনো বাড়ি চেনে না। শুধু এ বাড়ির জিনিসই চুরি করতে হবে? প্রতুলের ধারণা, কাকদের মধ্যে নাকি আলাদা আলাদা বাড়ি ভাগ করা আছে। এক কাক অন্য কাকের বাড়িতে ভাগ বসাতে যায় না। হুলো বেড়ালটা অবশ্য সারা পাড়া ঘুরে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায়, মনে হয় তার খিদের শেষ নেই।

ফ্ল্যাটের দরজায় খটখট করে শব্দ হতেই সুরমা ভয় পেয়েএকটু কেঁপে উঠলেন। এত জোর শব্দ কোনো ভিখিরি বা ফেরিওয়ালার তো নয়! সুরমার ধারণা পৃথিবীর সব গুণ্ডাবদমাশরা জেনে গেছে যে দুপুরবেলা তিনি একা থাকেন। কিছুদিন আগেও একটি সর্বক্ষণের কাজের মেয়ে ছিল। একদিন জানা গেল সে চিনি, আটা, তেল চুরি করে। সুরমা শুধু শুধু তাকে সন্দেহ করেননি, একদিন ধরেও ফেললেন হাতে নাতে। সেই মুহূর্তে তাড়িয়ে দিলেন তাকে। মেয়েটা কান্নাকাটি করে সুরমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে গিয়েছিল, তিনি গ্রাহ্য করেননি। একটা চোরকে কখনো বাড়িতে রাখা যায়? দুনিয়াটাই যেন চোর-ডাকাতে ভরে গেছে।

দরজার কাছে এসে সুরমা একটু কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কে?

ওধার থেকে একজন ভাঙা গলায় বললেন, মাসিমা, আমি ঝুনু। একবার দরজা খুলুন।

ঝুনু নামটি সুরমার মনে কোনো দাগ কাটলো না। কে ঝুনু? মাসিমা বলে ডাকলো। গলার আওয়াজটা একটু যেন চেনা মনে হচ্ছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই?

—মাসিমা, দরজাটা একবারটি খুলুন না!

—কী দরকার, ঐখান থেকেই বলো।

একটা জিনিষ এনেছি আপনাদের জন্য।

কী জিনিস ? কে পাঠিয়েছে ?

—নন্তুদা পাঠিয়েছে।

সুরমার সারা শরীর ঝিমঝিম করে উঠলো। নন্তু! এ বাড়িতে কেউ ও নাম উচ্চারণ করে না। গত এক বছরের মধ্যে নন্তু এদিকে ভুলেও পা বাড়ায়নি। সে কেন জিনিস পাঠাবে ? নন্তুর নাম করে যারা আসে, তাদের তো দরজা খোলার কোন প্রশ্নই নেই। ওরা কতজন এসেছে কে জানে !

নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে সুরমা বললেন, আমার কোনো জিনিসের দরকার নেই। ফেরৎ নিয়ে যাও !

ওপাশ থেকে ভাঙা কণ্ঠস্বরে উত্তর এলো, নন্তুদা দিয়ে যেতে বলেছে। আমি এখানেই রেখে যাচ্ছি। নন্তুদা আজ একবার আসতে পারে !

ধপাস করে কী যেন একটা পড়লো মেঝেতে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে একজনের নেমে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলেন সুরমা।

কী রেখে গেল ? বোমা, বন্দুক ? গয়নার পুঁটুলি ? এখন কী হবে ? সুরমা দরজার কাছে পাথরের মূর্তি মতন দাঁড়িয়ে রইলেন কিছু-ক্ষণ। নন্তু কি এইভাবে গায়ের ঝাল মেটাতে চায় ? দরজার বাইরে যে জিনিসটা পড়ে রইলো, পাশের ফ্ল্যাটের কেউ না কেউ একটু বাদেই সেটা দেখতে পাবে ! জিনিসটা বাইরে পড়ে থাকবে, না ভেতরে নিয়ে আসা উচিত ?

দরজার ছিটকিনি খুলে সামান্য একটু ফাঁক করলেন সুরমা। গলা ভাঙা ছেলেটা চলে যাবার নাম করে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে নেই তো ? কী জিনিস ফেলে গেল তাও দেখা যাচ্ছে না।

এবার দরজাটা ভালো করে খুলে সুরমা দেখলেন মাটিতে পড়ে আছে একটা বেশ বড় আকারের বোয়াল.মাছ। অন্ততঃ আড়াই কেজি ওজন হবেই। মাছটার কানকোয় সুতলি বাঁধা। ছেলেটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছিল।

ভয়াবহ কোনো জিনিস নয় হঠাৎ নন্তু একটা মাছ পাঠিয়েছে ?

মাছটা সোনালী রঙের চকচক করছে গা। একেবারে টাটকা। এতবড় মাছ বাড়িতে কোনদিন কেনা হয় না।

ঐ মাছ ভেতরে আনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু দরজার বাইরে পড়ে থাকবে ? এক্ষুণি ফেলে দেওয়া দরকার। অতবড় মাছটা কোথায় ফেলবেন সুরমা ? ছেলেটা বলে গেল, নন্তু আজ আসবে। এত সাহস সে কোথায় পেল, নাকি সে আসছে উল্টে ভয় দেখাতে !

মাছটা তাড়াতাড়ি ভেতরে এনে দরজা বন্ধ করে দিলেন সুরমা। এত ভালো, টাটকা একটা মাছ কি ফেলে দেওয়া যায় ? অন্য কোনো মাছ না পাঠিয়ে নন্তু বোয়াল মাছ পাঠিয়েছে। এত বড় বোয়াল মাছ বাজারে সচরাচর দেখাই যায় না। বোয়াল মাছের চচ্চড়া প্রতুল খুব ভালোবাসেন। পেটি গাদা করে কেটে ঝোল নয়, সমস্ত মাছটা সেদ্ধ করে ভেঙে ফেলে তারপর ঘি গরম মশলা দিয়ে শুকনো করে রান্না। প্রায়ই বলতেন,সেই দেশে থাকতে মায়ের হাতে রান্না যে বোয়াল মাছের চচ্চড়া খেয়েছি, সেরকম আর পেলাম না কখনো ! তারপর সুরমা প্রতুলের মায়ের কাছ থেকে এই রান্না শিখেছেন। প্রতুল তারিফ করেছেন। বোয়াল মাছের চচ্চড়া নন্তুরও খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু। টানাটানির সংসারে আস্তো একটা মাছ কেনা হয় আর কদিন ! বছরে বড়জোর একবার কি দুবার !

নন্তু খবর পাঠিয়েছে, সে আজ আসবে তার আগে পাঠিয়ে দিয়েছে এই মাছ। সে সুরমার হাতের রান্না চচ্চড়া খেতে চায়। কোনো হোটেল রেষ্টুরেণ্টে তো বোয়াল মাছের চচ্চড়া পাওয়া যাবে না। কেন আসবে নন্তু ? এ বাড়িতে ঢোকা না তার নিষেধ, তাকি সে ভূলে গেল ? একটা মাছ পাঠালে তাকে খাতির করা হবে ?

সুরমার চোখে জল এসে গেল। বাড়িতে আর একটা লোক নেই যে পরামর্শ চাওয়া যায়। স্বামীকে লুকিয়ে কোনো কিছু করতে ভয় পান সুরমা। কঠোর আদর্শে মানুষ প্রতুল ন্যায়-অন্যায় বোধ অতি প্রবল।

এখন বাজে মোটে এগারোটা। চারটের আগে ছেলে মেয়েরা কেউ স্কুল কলেজ থেকে বাড়ি ফি.বে না। নন্তু তাহলে দুপুরেই খেতে আসবে সে সময় প্রতুল বাড়িতে থাকবেন না, সে জানে।

নিজের মায়ের পেটের ভাই একদিন তাঁর হাতের রান্না খেতে চেয়েছে, তাও খাওয়াতে পারবেন না সুরমা? যতই অন্যায় করুক, তবু মায়ের পেটে ভাই তো।

একটু ছাই মেখে কুটতে হয় এই মাছ, কিন্তু আজকাল তো রান্না-ঘরে ছাই থাকে না। গ্যাসের ষ্টোভ। সুরমা বড় আঁশবঁটিটা বার করলেন। বাড়িতে গরম মশলা নেই। ঘি আছে একটুখানি। এমন টাটকা মাছের এমনিতেই ভালো স্বাদ হবে।

জেল থেকে যেদিন ছাড়া পায় নন্তু, 'সদিন নিজে তাকে আনতে গিয়েছিলেন প্রতুল। ট্যাক্সি করে এনেছেন। সুরমা রান্না সেরে রেখেছিলেন আগেই। জেলে ভালো করে খেতে পায়নি বলে বাড়িতে ফেরার একটু পরেই তাকে খেতে বসিয়ে দেওয়া হলো। প্রতুল তার সঙ্গে খেতে বসলেন না, পায়চারি করতে লাগলেন বারান্দায়। নন্তুর খাওয়া শেষ হয়ে গেলে প্রতুল তার সামনে একটা একশো টাকার নোট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, আমার বাড়িতে এই তোমার শেষ খাওয়া, নন্তু। সুটকেশ গুছিয়ে নাও, এ বাড়িতে তোমার আর জায়গা হবে না। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও!

মাথা নিচু করে নন্তু মিনমিন করে বলেছিল, আমাকে শেষবারের মতন ক্ষমা করুন জামাইবাবু। একটা লাষ্ট চান্স দিন।

প্রতুল বলেছিলেন, তোমাকে অনেকবার ক্ষমা করেছি। আর কোন চান্স দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তোমার জন্য আমার মান-সম্মান সব খোয়াবো? তোমার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই।

সুরমা প্রতিবাদ করতে পারেননি। প্রতুলের যুক্তি তিনি আগেই মেনে নিয়েছিলেন। নিজের ভাইয়ের জন্য কি তিনি নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন?

এত বড় মাছটা কোটার পর একটা ডেকচি ভরে গেল। এত মাছ কে খাবে? ভাগ্যিস ইনষ্টলমেণ্টে একটা রেফ্রিজারেটার কেনা হয়েছে গত মাসে, তাই কিছুটা রেখে দেওয়া যাবে।

নন্তু কখন এসে পড়বে কে জানে! সুরমা মাছটা যখন রান্না করছেন, তখন নন্তু এলে খেতে দেবেন ঠিকই। তবু তাঁকে বলতে হবে তোর জামাইবাবু এসে পড়ার আগে তুই চলে যা! আর কখনো এরকম মাছ-টাছ পাঠাবি না। চচ্চড়াতে মুড়ো দেওয়া যায় না। যে কোন মাছের মুড়ো নন্তুর খুব পছন্দ। মুড়োটা দিয়েও আলাদা একটা ঝোল করতে হবে।

নন্তু কি ভালো হয়ে গেছে? সে কি সৎ পথে রোজগার করে এই মাছটা কিনে পাঠিয়েছে? প্রতুল বলেছিলেন, অন্তত তিন বছর যদি সে সৎপথে থাকতে পারে, তার প্রমাণ দেয়, তাহলে তাকে আবার এই বাড়িতে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে।

নন্তুকে দেখার জন্য সুরমার মনটা হঠাৎ আকুলি বিকুলি করে উঠলো।

সুরমার বিয়ের পাঁচ বছর বাদে তার বাবা আর মা মারা গেলেন ছ'মাসের মধ্যে। সুরমারা তিন বোন, একটা মোটে ছোট ভাই ঐ নন্তু। তিন বোনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। নন্তুকে প্রথমে পাটনায় নিয়ে গেলেন তাঁর দিদি। সুরমার তুলনায় তাঁর দিদির সংসার অনেক সচ্ছল, জামাইবাবু পাটনার নাম করা উকিল। সুরমার ছোট বোনও নন্তুকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল দুর্গাপুরে, কিন্তু দিদি জোর করলেন। পাটনাতেই নন্তু প্রথম কুসঙ্গে পড়ে। লেখাপড়া নষ্ট হয়ে গেল। তিন বছর পর দিদি নন্তুকে পাঠিয়ে দিলেন সুরমার কাছে। নন্তুর কাণ্ড কারখানায় জামাইবাবু খুব বিরক্ত, তাছাড়া কলকাতায় না থাকলে ও ছেলে একেবারে উচ্ছন্নে যাবে!

জানলায় ঝপাস করে একটা শব্দ হতেই সুরমা চমকে উঠে দেখতে পেলেন হুলো বেড়ালটাকে। মাছের গন্ধে গন্ধে ঠিক এসেছে! সুরমা

লাঠি তুলে মারতে গেলেন। ওর মুখখানা দেখলেই ভয় করে। এক এক সময় মনে হয় গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বেড়ালটাকে তাড়িয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন সুরমা। এত মাছ, ঐ বেড়ালটা কখন এসে মুখ দিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই।

দরজায় কি কোনো শব্দ হলো? নন্তু এসে গেল? রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুরমা শুনতে পেলেন পাশের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ হচ্ছে।

নন্তুকে এখানকার স্কুলে ক্লাস টেনে ভর্তি করা হয়েছিল। পরপর দু'বার সে ফেল করলো। প্রতুল নিজে তাকে পড়াতে বসিয়ে চড় চাপড় মারলেন কয়েকবার! তারপর একদিন বললেন, ওর পড়াশুনোয় মাথা নেই ও কোনদিন পাশ করতে পারবে না। পাটনায় হিন্দী মিডিয়ামে কয়েক বছর পড়িয়ে ওর আরও ক্ষতি করা হয়েছে। পড়াশুনোয় সবার মাথা থাকে না, নন্তু অন্য কোনো কাজ শিখতে পারতো। প্রতুল বললেন, কিন্তু অন্তত হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ না করলে আজকাল কোনো লাইনেই যাওয়া যায় না। অফিসে বেয়ারার চাকরিও কেউ দেবে না।

কী করে যেন ঠিক খারাপ খারাপ ছেলেদেরই বন্ধু হিসেবে বেছে নিল নন্তু। প্রায়ই তার নামে গুণ্ডামি মারামারির অভিযোগ আসে। অনেক চেষ্টা করে তার জন্য বেহালায় একটা কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিসের কাজ জুটিয়ে দিলেন প্রতুল। সেখান থেকেও নন্তু একদিন ফিরে এলো রক্তাক্ত শরীর নিয়ে। একদল শ্রমিক নাকি তাকে সেই কারখানায় ঢুকতে দিতে চায় না, তাদের নিজেদের লোক আছে, তাই নন্তুকে মেরেছে।

তারপর থেকে নন্তু প্রায় ছাড়া গরু হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে খায়, সারাদিন বাইরে বাইরে কাটায়। চেহারাটা হয়ে উঠলো পাড়ার মাস্তানদের মতন। সুরমার ছেলে সৈকত নন্তুর থেকে সাত বছরের ছোট, সে সেবার স্কুল ফাইনাল দিচ্ছে। শেষ পরীক্ষা দিয়ে ফেরার

দিন দু'টি অচেনা ছেলে রাস্তায় তাকে ধরে হঠাৎ ঠ্যাঙালো। তারা নাকি বলেছিল, শালা, নন্তু তোর মামা হয়! তাকে পেলে গলা কেটে দিতুম!

সেইদিনই প্রতুল সুরমাকে বলেছিলেন, তোমার গুণধর ভাইটির জন্য তোমার নিজের ছেলের সর্বনাশ হবে তাই কি তুমি চাও? ও-ছেলের সংস্পর্শে থাকলেই তোমার ছেলেমেয়ের ক্ষতি হবে!

এরপর কিছুদিন নন্তু চুপচাপ ছিল। কিন্তু অতবড় ছেলে হয়েও সে কোনো রোজগার করে না, দিদির সংসারে বসে বসে খায়, এর গ্লানি সে অনুভব করেছিল ঠিকই।

এক রাত্তিরে সে বাড়ি ফিরলো না। সারা রাত জেগে কাটিয়েছিলেন সুরমা। একটা বাপ-মা মরা ছেলে, লেখাপড়া হলো না বলে কি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে? প্রতুল তাকে শাসন করেন ঠিকই, কিন্তু তার খাওয়া পরার জন্য কোনো গঞ্জনা দেন না কখনো। লেখাপড়া শেখেনি বলে কোনো ক্রমেই কি ভালো পথে কিছু রোজগার করতে পারে না?

দু'দিন পরে জানা গেল, আরও তিনটি ছেলের সঙ্গে নন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। বেলগাছিয়ায় রেলের ইয়ার্ডে ওরা চুরি করতে ঢুকেছিল। ওদের মধ্যে একটি ছেলে পেটে গুলি খেয়ে এখন তখন অবস্থা। দেড় বছরের জেল হয়েছিল নন্তুর। প্রতুল সুরমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এর পরেও তুমি তোমার ভাইকে আশ্রয় দিতে চাও? তোমার ছেলে মেয়েরা রাস্তায় বেরুলে অন্যরা আঙুল দেখিয়ে বলবে, তোর মামা একটা জেল খাটা চোর!

দেড়টার মধ্যে রান্না শেষ করে ফেললেন সুরমা। এখন স্নান করতে গেলে তার মধ্যেই যদি নন্তু এসে পড়ে, দরজা খুলবে কে? স্নানের ঘর থেকে সুরমা শুনতেও পাবেন না, নন্তু দরজা ধাক্কিয়ে ফিরে যাবে। থাক, তিনি বরং বিকেলে স্নান করবেন।

আড়াইটে···পৌনে তিনটে বেজে গেল তার মধ্যেও নন্তু এলো

না। আর কখন সে আসবে? কাক দুটো অলুক্ষুণে ভাবে ডেকেই চলেছে। এই নিস্তব্ধ দুপুরে শুধু কাকের ডাকের মতন কর্কশ যেন আর কিছু হতে পারে না! সুরমা হুস হুস করতে লাগলেন। কাক দুটো যেন মজা করছে সুরমাকে নিয়ে, একটু উড়ে যায়, আবার ফিরে আসে।

আর দেরি করা যায় না। সুরমার খিদে পেয়ে গেছে। এতখানি মাছ রান্না করা কি সোজা কথা! সুরমা খেতে বসে গেলেন তিনটের সময়। দুটো ডেকচিতে ভরা মাছ, তবু সুরমা একটুও নিলেন না। অন্য কেউ খাবার আগেই তিনি খাবেন, তা কি কখনো হয়!

নন্তু এলো না কেন? বোয়াল মাছের চচ্চড়া খাওয়ার শখ হয়েছিল তার, কোনো জায়গায় এতবড় একটা টাটকা মাছ দেখে কিনে ফেলেছে ঝোঁকের মাথায়। দিদির কাছে পাঠিয়েছে, নিশ্চয়ই সে ভেবেছে, সে খেতে চাইলে দিদি তাকে ফেরাবে না! কোথায় থাকে নন্তু কে জানে! একশো টাকা সম্বল করে সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পাটনায় দিদির কাছে যায়নি। দুর্গাপুরে রূপার কাছেও যায়নি। এতদিনের মধ্যে আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি তার!

সে কি রাত্তিরে আসতে সাহস করবে, প্রতুলের সামনে?

চারটের পর স্কুল থেকে ফিরলো দুই মেয়ে। ওরা পাশের একটা ক্লাবে খেলতে যায় বিকেলে। স্কুল থেকে ফিরেই ক্লাবে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রুটি তরকারি করা আছে ওদের জন্য। এত মাছ একদিনে খেয়ে শেষ করা যাবে না। সুরমা জিজ্ঞেস করলেন, রুটি দিয়ে একটু মাছের চচ্চড়া খাবি? খুব ভালো মাছ।

দুই মেয়েই আঁতকে উঠে একসঙ্গে বললো, বিকেল বেলায় মাছ খাবো? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মা! মেয়েরা কেউ মাছ তেমন ভালবাসে না। ওদের পছন্দ শুধু মাংস। মাংস আর ক'দিন হয়! মাছ দেখলে ওরা ঠোঁট ব্যাকায়। কোন্‌টা কী মাছ তাও জানে না। মাছের বদলে ডিমের ঝোল পেলেও ওরা খুশী।

প্রতুল ফিরলেন সাতটার সময়, ছেলে তার দু'পাঁচ মিনিট আগে। সুরমা ওদের দু'জনকে এড়িয়ে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলেন। তিনি কোনো কথা গোপন রাখতে পারেন না। তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। তিনি ছাদে চলে গেলেন। এই ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদটা মস্ত বড়, অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। আকাশ আজ মেঘলা। শুক্লপক্ষ বলে চাপা একটা আলো রয়েছে, পাশের নারকেল গাছটায় হাওয়া বইছে ছিলিমিলি শব্দে।

সুরমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। শুধু নন্তুর জন্য নয়। নন্তু চলে যাবার পর মাঝে মাঝেই তার জন্য কেঁদেছেন বটে, কিন্তু এতদিনে সেই শোক খানিকটা ফিকে হয়ে গেছে। নন্তুর জন্য চেষ্টা তো কম করা হয়নি। পৃথিবীতে এত চোর-গুণ্ডা, তাদের পরিবার থেকেও একজন সেই দলে যোগ দিয়েছে। তার জন্য তো এ বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েদেরও নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

নন্তু আজ হঠাৎ মাছটা পাঠিয়ে বিপদে ফেলতে গেল কেন? এমনিতে মাছটা ফেলে দিলেও হতো. এখন এত কষ্ট করে রান্না করা হলো, শুধু নন্তু খেতে চেয়েছিল বলেই, এখন কি ফেলে দেওয়া যায়? প্রতুল ঐ মাছ খেতে এত ভালোবাসেন! এখন প্রতুলের কাছে কী মিথ্যে কথা বলবেন তিনি।

মাঝে মাঝে এই ফ্ল্যাট বাড়িতে তরকারিওয়ালা, মাছওয়ালা আসে। বেশ বেলা করেই আসে। তখন ওদের কাছ থেকে সুরমা কোনোদিন মাছ কেনেন না। কিন্তু যদি বলা যায়, একটা মাছওয়ালা এসে এই মাছটা খুব সস্তায় দিতে চাইলো, এত ভালো মাছ, তাই কিনে ফেললুম। এটা খুব অবিশ্বাস্য হবে না। বেশী বেলা হয়ে গেলে মাছওয়ালারা অনেক সময় খুব সস্তায় মাছ দিয়ে যায়। এই কথাটা শুনে প্রতুল কি বলবেন, তাও সুরমা আন্দাজ করতে পারেন। প্রতুল হেসে বলবেন, তুমি সস্তায় মাছ কিনেছো, নিশ্চয়ই পচা মাছ, তোমাকে ঠকিয়েছে! মাছটা পচা কিনা তা তো খেয়েই বুঝবেন প্রতুল!

ছাদের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘুরতে ঘুরতে সুরমা সেই বাক্যটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে লাগলেন বারবার। কোনভাবে বললে পুরোপুরি সত্যি মনে হবে! মাছওয়ালার নাম বিরজু, তার নামটাও জুড়ে দিতে হবে। রাত্রে সবাই খেতে বসে এক সঙ্গে। সুরমা আগে অন্যদের পরিবেশন করে তারপর বসে পড়েন নিজেও। আজ প্রত্যেকের জন্য আলাদা বাটিতে করে মাছ সাজিয়ে দিলেন।

সৈকতই প্রথম অবাক হয়ে বললো, এ কী মা, এত মাছ? কে বাজার করলো?

একটুখানি মুখে দিয়ে সে আবার বললো, দারুণ রান্না হয়েছে তো।

প্রতুলও বিস্মিতভাবে চেয়ে বললেন, এত মাছ কোথায় পেলে!

—নন্তু পাঠিয়েছে। কথাটা বলে ফেলেই সুরমার ইচ্ছে করলো নিজের গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারতে। ছাদে গিয়ে এতক্ষণ ধরে রিহার্সাল দিয়েও ঠিক সময়ে কথাটা মনে এলো না? নিজের বোকামিতে নিজের ওপরেই প্রচণ্ড রাগ হয়।

প্রতুল বাটির দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন, নন্তু পাঠিয়েছে মানে! সে হঠাৎ মাছ পাঠালো কেন? নিজে এসেছিল?

আর মিথ্যে কথা বলার উপায় নেই সুরমার। রক্তশূন্য মুখে বললেন, একটা ছেলে এসে ওর নাম করে দিয়ে গেল।

—তুমি অমনি নিয়ে নিলে?

—দরজার সামনে ফেলে রেখে গেল যে।

—দিদিকে সে চুরির টাকায় মাছ ঘুষ দিতে চেয়েছে? তুমি এই মাছ খেতে চাও তো যত ইচ্ছে খাও, আমি···মাছের বাটিটা এত জোরে ঠেলে দিলেন প্রতুল যে আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল টেবিল থেকে। সুরমার হাতে লেগেই সেটা আটকে গেল।

প্রতুল ছেলেমেয়েদের দিকে কড়া চোখে তাকালেন। তারপর আপন মনে বললেন, যার খুশী সে ঐ চুরির টাকার মাছ খেতে পারে,

আমি বরং সারাজীবন নিরামিষ খেয়ে থাকবো, তবু···

সুরমা চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলে গেলেন রান্নাঘরে। এই চোখের জল শুধু নিজের ওপর রাগে। একটা মিথ্যে কথা বলতে পারলেই যদি স্বামী ও সন্তানদের একদিন ভালো করে খাওয়ানো যেত···সেটুকু যোগ্যতাও তার নেই। এক সময় ছোট মেয়ে এসে পিঠে হাত দিয়ে বললো, মা খেতে যাবে না? এসো খেয়ে নাও।

খাওয়ার টেবিল থেকে সবাই উঠে গেছে। প্রতুলের ওরকম কথার পর কেউ আর মাছের বাটি ছোঁয়নি। সব কটা বাটির মাছ তিনি আবার ডেকচিতে ঢাললেন। ফেললে তো এক সঙ্গেই ফেলতে হবে। নিজের হাতে যত্ন করে রান্না জিনিস ফেলে দেওয়া যে কত শক্ত, অন্যরা কি বুঝবে?

নন্তু আসবে বলেও এলো না কেন? সে তো এমনি এমনি মাছ পাঠায়নি, নিজে এসে সেই মাছ খাবে, সে কথাও বলে পাঠিয়েছিল। তাহলে সে মত বদলালো কেন?

কেন যেন সুরমার ধারণা হচ্ছে, এই মাছ কেনার টাকা কোনো ভালোভাবেই রোজগার করেছে নন্তু। জামাইবাবুকে সে চেনে, না হলে কি সে পাঠাতে সাহস পেত। নিজে এসে সে কথা বলতে পারলো না? আর একটা নতুন চিন্তা চাপলো সুরমার মাথায়। আজই নন্তুর কোনো বিপদ হয়নি তো? পুলিশের হাতে ধরা পড়লো আবার? দু'দলের মধ্যে মারামারিও তো যখন তখন হয়, দু' একজন মরে যায়। দিদিকে দিয়ে রান্না করিয়েও খেতে এলো না সে?

খুটখাট করে কাজ সারতে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে দিলেন সুরমা। প্রতুল ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিছানায় শুয়েও ঘুম এলো না সুরমার, ছট-ফট করতে লাগলেন। তাঁর এখনো মনে হচ্ছে, নন্তু ঠিক আসবে। হঠাৎ কিসের শব্দ হলো না? দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে? এত রাত্রে বেল না বাজিয়ে ঠুকঠুক করছে দরজায়। সুরমা হুড়মুড় করে উঠে বসলেন। হ্যাঁ একটা শব্দ হচ্ছে ঠিকই। সুরমা প্রায় ছুটেই চলে

এলেন বাইরে। প্রতুল যাই বলুন না কেন, নন্তকে তিনি ফেরাতে পারবেন না আজ।

না, বাইরের দরজায় কোনো শব্দ নেই। শব্দটা হচ্ছে রান্নাঘরে। জানলাটা ভেজানো ছিল, সেটা ঠেলে ঠেলে খুলেছে হুলো বেড়ালটা। আকাশে এখন কিছুটা জ্যোৎস্না ফুটেছে, তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সুরমাকে দেখেও বেড়ালটা জানলার শিকে মুখ গলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুরমা। হুলোটাকে দেখে ভয় পেলেন না, তাড়ালেন না। তিনি বললেন, আয় খাবি আয়! মাছের ডেকচিটা নিয়ে এসে মাটিতে অনেকটা মাছ ঢেলে দিলেন তিনি। হুলোটা নির্ভয়ে এসে তাতে মুখ দিল। যেন এটা তার দাবিই ছিল। খাক, তৃপ্তি করে খাক।

সুরমা ভাবলেন, খানিকটা রেখে দেবেন কাল সকালের জন্য। কাক দুটোকে দিতে হবে। ওদের দেখলেই লোকে তাড়ায়, ওদেরও প্রত্যেক দিনই খেতে হয় চুরি চামারি করে। যত্ন করে ডেকে তো কেউ কখনো খাওয়ায় না।

গোপন

জয়াকে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নেবার একটু পরেই সব আলো নিভে গেল। একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আফশোসের সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালো রজত। আর পাঁচ মিনিট আগে লোডশেডিং হতে পারতো না ? নেমে যাবার সময় জয়া তার হাতটাও ছুঁতে দেয় নি। জয়া ভয় পায়। ভয় ঠিক নয়। লজ্জাও নয়। এক ধরনের অস্বস্তি। এ পাড়ার একটি যুবককে জয়া প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই অবনীর সামনে সে রজতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা দেখাতে চায় না! ট্যাক্সির মধ্যেও জয়া খানিকটা দূরত্ব রেখে বসে। তা বসুক। রজত তো আর ট্যাক্সির মধ্যে জয়াকে চুমু খেতে চায় না। কিন্তু বিদায় নেবার সময় একটুখানি হাতের সঙ্গে হাতের স্পর্শ···

একটু আগে লোডশেডিং হলে রজত জয়ার একটা হাত ধরে নাকের কাছে আনতো। জয়ার হাতেরও একটা সুগন্ধ আছে।

এখন আর কোথাও যাবার নেই। রজত বাড়িতেই ফিরবে।

রজতদের পাড়াটাও অন্ধকার। আজ সন্ধেবেলা বাতাসেরও তেজ নেই, বাড়ি ফিরে অন্ধকারে ভূত হয়ে থাকতে হবে। একটা ইনভার্টার কেনা খুবই দরকার, কিন্তু নতুন বাড়িতে যাবার আগে এনে লাভ নেই, শুধু শুধু লাইন পাল্টাবার ঝামেলা।

ট্যাক্সিটা গলির মধ্যে ঢুকতে চাইলো না। ঝগড়া করার ইচ্ছে নেই রজতের। সে ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়লো। এখন তাকে হিসেব করে হাঁটতে হবে ফুটপাথের কোথায় কোথায় ভাঙা তা প্রায় তার মুখস্থ, ডান পাশে দুটো হাইড্রান্টের ঢাকনা নেই। ফুটপাথের এক দিকে ঘেঁষে পাড়ার ছেলেরা গাছ লাগিয়েছে। কিছুই দেখা যায় না।

রজতের বেশি ভয় কুকুরদের। ভুলে গায়ে পা পড়লেই কামড়ে দেবে। গ্রামের রাস্তায় অন্ধকারে যেমন সাপের ভয়, কলকাতায় তেমনি কুকুর। ওরা যেখানে সেখানে শুয়ে থাকে।

খানিক আগে রজত তার বান্ধবীর সঙ্গে আমেজময় সময় কাটিয়েছে, এখন সে কুকুরের ভয়ে সিঁটকে হাঁটছে। একই অন্ধকার, যদি সে এখন জয়ার পাশে বসে থাকতো। এই অন্ধকারই স্বর্ণাভ বাঙ্‌ময় হয়ে উঠতো।

সদর দরজাটা খোলা। রজত ভেতরে পা দিতেই সিঁড়ির নিচে কি যেন খচর খচর করে উঠলো রজতের। সে চোর গুণ্ডার কথা ভাবল না। তার মনে হলো, রাস্তার কুকুর!

পুরনো আমলের ফ্ল্যাটবাড়ি। এক সময় দরজার কাছে একজন দারোয়ান থাকতো, এখনো সে আছে বটে, কিন্তু তার কাজের ঠিক নেই। এ বাড়ির দেওয়ালে প্লাস্টার, চুন-বালি খসে খসে পড়ছে, কিন্তু এ বাড়ির মালিকের কোনো মায়া নেই বাড়ি সম্পর্কে। সিঁড়ির রেলিং দু'এক জায়গায় বিপজ্জনকভাবে ভাঙা কিন্তু পুরনো ভাড়াটেদের অসুবিধের দিকগুলো দেখতে যাবে কেন?

যদি সিঁড়ির ধাপেও কোন কুকুর শুয়ে থাকে? রজতের মাথায় খেলে গেল চোদ্দটি ইঞ্জেকশানের কথা, এ পাড়ার একটি ড্রাইভারকে নিতে হয়েছে কয়েকদিন আগেই।

নিঃসাড়ে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকার পর রজত পকেট থেকে লাইটার বার করে জ্বাললো।

সিঁড়ির মুখটা পরিষ্কার, কিন্তু সিঁড়ির নিচে কিছু আছে।

রজত আবার চমকে উঠলো। কুকুর নয়, একটি রমণী। জোড়াসনে সোজা হয়ে বসে স্থিরভাবে চেয়ে আছে রজতের দিকে। এক রাশ কালো চুলের পটভূমিকায় শুধু দেখা যাচ্ছে তার মুখখানা।

লাইটার বেশিক্ষণ জ্বালিয়ে রাখলে সেটা গরম হয়ে যায়। নিভিয়ে দিয়ে রজত কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে রইলো। সে কি ভুল দেখছে?

বাইরের কোন ভিখিরি টিখিরি এসে এ রকম একটা বারোয়ারি বাড়ির-সিঁড়ির নিচে আশ্রয় নেওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু রজতের মনে হলো, এ রকম অসাধারণ সুন্দরী সে আগে কখনো দেখেনি।

আবার লাইটার জ্বেলে রজত দেখলো সেই রমণীটি সেই রকম একই ভঙ্গিতে চেয়ে আছে। রজতের দৃষ্টি বিভ্রম নয়। সত্যিই সে সুন্দরী। এবার তার কাছাকাছি অন্ধকার থেকে শোনা গেল ওঁয়া ওঁয়া করে একটা বাচ্চার কান্না।

রজত আর দাঁড়ালো না। সে এ বাড়ির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। সিঁড়ির নিচে যে খুশী এসে আশ্রয় নিক, তাতে তার কি যায় আসে? আর দু'মাসের মধ্যেই সে এ বাড়ির মালিককে একেবারে হতবাক করে দিয়ে নিঃশর্তে তার ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাবে।

রজত উঠে এলো তিনতলায়। দাদা, বৌদি, তাদের দুই ছেলে মেয়ে, মা, একজন কাজের লোক, অথচ সব মিলিয়ে ঘর মাত্র আড়াই খানা। সবচেয়ে ছোট ঘরখানা রজতের। এই ঘরে জয়াকে আনা যায় না।

মোমবাতির আলোয় জামা-প্যাণ্ট ছেড়ে রজত বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিল। কয়েকদিন ধরে বেশ জমপেশ করে গরম পড়েছে। বঙ্গোপসাগরের বাতাস আসছে না। এখন কালবৈশাখীর সময়, কিন্তু সেই ঝড়ও নিরুদ্দেশ।

নিজের ঘরে ফিরে রজত রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দিল। অন্ধকারের মধ্যেও লোকজনের চলাফেরার বিরাম নেই। একসময় এ বাড়িটার সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা ছিল। এখন ঘেঁষাঘেঁষি অনেক বাড়ি উঠে গেছে।

রজত ভুরু কুঁচকে ভাবলো। অস্পষ্ট আলোয় দেখা ঐ সুন্দরী রমণীটি কে? ঠিক যেন টিশিয়ানের আঁকা একটা ছবি। এমন এক সুন্দরী এসে সিঁড়ির নিচে বসে থাকবে কেন? কি গভীর কালো চোখে

সে তাকিয়েছিল রজতের দিকে।

মোমবাতির আলোয় বই পড়া যায় না। টি. ভি. দেখা যাবে না। ক্যাসেট প্লেয়ারটিতে ব্যাটারি ভরা নেই। তা হলে এই সন্ধে সাড়ে সাতটায় তুমি আর কি করতে পারো ?

রজত একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়লো।

কয়েকদিন আগে এই ঘরের শিলিং থেকে হুড়মুড় করে বেশ বড় একটা চাঙ্গর ভেঙ্গে পড়েছিল। বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার। ঘুমের মধ্যে আচমকা এরকম মাথায় এসে পড়তে পারে বলে রজত মশারি টাঙিয়ে শোয়। বাড়িওয়ালা তো কিছু করবে না। দাদাও এ ফ্ল্যাট সারাবার জন্য একটা পয়সাও খরচ করতে রাজি নয়। চাকরি বদল করে দাদা সপরিবারে চলে যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোরে আগামী মাসে। রজতও একটা সরকারি অ্যাপার্টমেণ্ট পেয়ে যাচ্ছে আয়রন সাইড রোডে। খুব সুন্দর সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মাকে নিয়ে সে ওখানে উঠে যাবে। তারপর জয়া আসবে।

সিঁড়ির নিচে একজন রহস্যময়ী বসে আছে। সঙ্গে একটা শিশু।

কিছুক্ষণ বাদে রজত খেয়াল করলো, ঘুরে ফিরে ঐ রমণীটির মুখখানা বারবার ভেসে উঠছে তার চোখের সামনে। সে জয়ার কথা ভাবছে না। এই রহস্যটা ভাঙা দরকার।

একটা টর্চ নিয়ে নিচে নামার জন্য তৈরি হতেই আলো জ্বলে উঠলো। যাক ভালই হলো, টর্চ নিয়ে নিচে নামতে গেলে মা হয়ত কৌতূহলী হয়ে কারণটা জানতে চাইতেন। এখন রজত সিগারেট কেনার ছুতো করে যেতে পারে।

উজ্জ্বল আলোয় রহস্য অনেকটা কেটে যেতে বাধ্য। সেই রমণীটি এখনো সেখানে বসে আছে বটে, কিন্তু বিশেষ বিস্ময়ের কিছু নেই। লাইটারের শিখায় শুধু ওর মুখখানি দেখতে পেয়েছিল। এখন চড়া আলোয় বোঝা গেল, সে ভদ্দরলোক শ্রেণীর নয়, লাল ফুল ছাপ

শাড়ি পরা একজন দেহাতী স্ত্রীলোক। ঈষৎ পাশ ফিরে বসে সে বাচ্চাটিকে স্তন পান করাচ্ছে। সে রজতের পায়ের শব্দ শুনে সে একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

রজত একেবারে ভুল দেখেনি। যে কোন বিচারেই মেয়েটাকে যথেষ্ট রূপসী বলা যায়। টানা টানা চোখ, টিকোলো নাক, প্রশস্ত কপাল, সম্পূর্ণ ভরা নদীর মতন স্বাস্থ্য। শুধু মুখে একটা ভয় মাখানো সারল্যের জন্যই গ্রাম্যতার ছাপটা বোঝা যায়। এই নারী এখনও শহর চেনে না।

রজত আর বেশী কৌতূহল দেখাল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিগারেট কিনতে গেল। ফিরে আসার সময় সে আবার স্ত্রীলোকটির দিকে এক ঝলক না তাকিয়ে পারলো না। তার মনে হলো, গ্রাম কিংবা পাহাড় অঞ্চলের এই স্বাস্থ্যবতী তরুণীটি কেন শহরে এসে সিঁড়ির তলায় এমনভাবে বসে থাকে? প্রকৃতি কি তার সন্তান সন্ততিদের ধরে রাখতে পারে না?

রাত্তিরবেলা জয়ার মুখের পাশাপাশি এ মুখখানা রজত দেখলো অনেকবার।

পরদিন রহস্যটা একেবারেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

ষাট-সত্তর বছর আগে কলকাতার বড়লোক শ্রেণী বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দেওয়াটা একটা লাভজনক ব্যবসা মনে করতো। তখন এত রকম ট্যাক্সের ঝামেলা ছিল না। তখন এইসব ফ্ল্যাট বাড়ির ব্যবস্থাও বেশ ভাল ছিল, ঝি,চাকর, দারোয়ানদের আলাদা ঘরের ব্যবস্থা ছিল, ছেলে-মেয়েদের খেলবার সেই জায়গাটিতে এখন গাড়ি সারাবার কারখানা হয়েছে।

এ বাড়ির দারোয়ান ছিল হীরালাল। বয়স তার বেশি না, চল্লিশের নিচেই হবে, কিন্তু প্রায়ই অসুখে ভুগতো সে। একবার ছুটি নিয়ে দেশে গেল, ছ'মাসের মধ্যে আর ফিরলো না। এ বাড়ির মালিক তার ঘরখানাও ভাড়া দিয়ে দিল একজন দোকানদারকে।

হীরালাল ফিরলে তাকে জানানো হলো যে তার আর চাকরি নেই।

হীরালাল তবু গেল না। সে বিনা মাইনের দারোয়ান গিরি চালিয়ে যেতে লাগলো। শুয়ে থাকে তারই আগেকার কোয়ার্টারের বারান্দায়। তার অসুখও সারে নি। চেহারাটা শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে, সব সময় খকখক করে কাশে। যেহেতু অন্য কোন দারোয়ান আর নিয়োগ করা হয় নি। বাড়ির মালিক হীরালালকেও মাইনে দেবে না। ভাড়াটেরা দয়া করে প্রত্যেকে ওকে মাসে পনেরো-কুড়িটাকা করে দেয়। কারুর বাড়িতে রান্না বেশি হলে হীরালালকে ডাকে।

সেই হীরালাল আবার দেশে গিয়ে নিয়ে এসেছে তার বউ আর দুটি বাচ্চাকে। বউকে তো আর বারান্দায় বেআব্রু অবস্থায় রাখা যায় না। পুরনো বাড়ি, সিঁড়ির নিচে অনেকটা জায়গা প্রায় একটা ছোটখাটো ঘরের মতন।

আর তো সবই ঠিক ছিল, কিন্তু রুগ্ন, বুড়োটে চেহারার হীরালালের এমন স্বাস্থ্যবতী যুবতী বউ থাকবে কেন? এটা ঠিক যেন মেনে নেওয়া যায় না। যোগ্য প্রহরী না থাকলে এরকম যৌবন অনেক বিপদ ডেকে আনতে পারে।

এ বাড়ির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না রজত। সে সকালে বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যের পর ফিরে নিজের ঘরে বসে থাকে। অন্য ফ্ল্যাটের লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা করে না কখনো। সুতরাং অন্য ভাড়াটেরা হীরালালের বউকে নিয়ে কি আলোচনা করছে তা রজতের জানার কথা নয়।

যাওয়া আসার পথে সে শুধু মেয়েটিকে একবার করে দেখে। দিনেরবেলা মেয়েটি প্রায় অধিকাংশ সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকে। সিঁড়ির তলায় ঐ কুঠরি থেকে ওকে কখনো বেরুতেও দেখে না রজত। অমন যৌবন নিয়েও অন্য কোন পুরুষকে প্রলুব্ধ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই তার।

মেয়েটিকে দেখে রজত প্রত্যেকবার এক ধরনের বিরক্তি বোধ করে।

চোখের সামনে একটা কিছু অন্যায় দেখেও যখন প্রতিকার করা যায় না, তখন মানুষের মনে এরকম আত্ম-বিরক্তি আসে। এই রমণীটি দিনের পর দিন ঐ অন্ধকার সিঁড়ির তলায় জীবন কাটাবে। ওর সুন্দর স্বাস্থ্যটি তা হলে অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। এটা একটা অন্যায় না? কিন্তু এবিষয়ে রজতের কোন কথা বলার উপায় নেই।

প্রথম দিন লাইটারের কাঁপা কাঁপা আলোয় মেয়েটির মুখখানা দেখে রজতের যে অসাধারণ সুন্দর মনে হয়েছিল, সে ছবিটি তার চোখ থেকে এখনও মুছে যায় নি। দিনের আলোতেও সে সুন্দর। একদিন মেয়েটিকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় সে দেখলো, রজত একবার চোখ ফিরিয়ে নিয়েও আবার তাকালো। মেয়েটি বেশ দীর্ঘাঙ্গী, তার কোমরের নিখুঁত ভাঁজ দেখলে কোনারকের ভাস্কর্যের কথা মনে পড়ে। এর বয়স তিরিশ বত্রিশের কম নিশ্চয়ই নয়। পরিপূর্ণ রমণী বোধহয় একেই বলা যায়।

হীরালালের বউয়ের নাম জানে না রজত। মনে মনে ওর নাম দিয়েছে শঙ্করী। আপনে না পায় ঠাঁই শঙ্করাকে ডাকে এরকম একটা প্রবাদ আছে না।

এক এক সময় রজতের মনে একটা অপরাধবোধও জাগে। সে যে প্রত্যেকদিন এ শঙ্করীকে দু'বার করে দেখে যায়, তার মধ্যে কি লোভ আছে? জয়াকে সে ভালোবাসে, অথচ লোভ করছে অন্য রমণীর শরীর?

তারপর সে নিজেকে বোঝায়, লোভ নয়, সে দেখছে সৌন্দর্য। জয়াকে ভালোবাসে বলে সে সারাজীবন অন্য মেয়েদের দিকে তাকাতে পারবে না, এর কি কোন মানে আছে? জয়াও তো কত অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলে, হাসে, গল্প করে। এমনকি ওদের পাড়ার অবনী নামে যে ছেলেটিকে জয়া প্রত্যাখ্যান করেছে একবার, তার সঙ্গে জয়া কথা বলা বন্ধ করে নি। অবনীর যাতে মনে আঘাত না লাগে, সেইজন্য জয়া ও রজতের পাশাপাশিও হাঁটে না।

রেডিও স্টেশনের জয়ার একটা প্রোগ্রাম রেকর্ডিং ছিল, রজত ওর জন্য অপেক্ষা করছিল বাইরে। জয়া বেরিয়ে আসার পর একসঙ্গে দু'জন হাঁটতে লাগলো রাজভবনের পাশ দিয়ে।

সন্ধের পর এদিকটা বেশ নিরালা থাকে। ইচ্ছে করলে হাতও ধরা যায়। আকাশের গুমোট দশা কেটেছে। প্রবল হাওয়া দিচ্ছে আজ, বারবার উড়ে যাচ্ছে জয়ার শাড়ির আঁচল।

এক একবার রজতের চোখ চলে যাচ্ছে জয়ার নগ্ন কোমরের দিকে। জয়াকেও অনেকেই সুন্দরী বলে, তবে তেমন লম্বা নয়। জয়ার শরীর থেকে আসছে একটা সুন্দর গন্ধ।

তবু রজতের বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে শঙ্করীর কোমরের খাঁজ ও সুঠাম গড়ন। হীরালালদের বাড়ি দুমকা জেলায়, ওর স্ত্রীর ঠিক যেন পাথর কাটা মূর্তির মতন শরীর।

জয়ার সঙ্গে শঙ্করীর কোন তুলনাই চলে না। জয়ার সৌন্দর্য শুধু তার শরীরে নয়, তার ব্যক্তিত্বেও। তার ব্যবহার, তার হাসি, তার গানের গলা, তার নম্রতা, যে কোন একটা কথা অর্ধেকটা শুনেই বুঝে ফেলার ক্ষমতা এইসব মিলিয়েই তো জয়া। সেই জয়াকে ভালবাসে রজত। জয়া যদি এর দ্বিগুণ সুন্দরী হতো, অথচ বোকা হতো, তাহলে সেই জয়াকে কিছুতেই রজত বিয়ে করতে রাজি হতো না।

তবু জয়ার কোমরের দিকে বারবার চেয়ে রজত শঙ্করীর কোমরের সঙ্গে তুলনা না দিয়ে পারছে না। এই অদ্ভুত ইচ্ছেটার জন্য তার নিজের গালে চড় মারতেও ইচ্ছে করছে।

এই কথাটা জয়াকে বলা যাবে না। জয়ার সঙ্গে সে আকাশ-পাতাল কত রকম বিষয় নিয়ে গল্প করে, কোন কিছুই গোপন করে না, কিন্তু হীরালালের বউয়ের প্রসঙ্গটা একবারও তোলা হয় নি। দু'জনের কোমরের তুলনাটা মনে আসার পর এখন কেমন যেন সংকোচ হচ্ছে। আর বলা হলো না। তা হলে, পৃথিবীতে সবচেয়ে যে কাছের মানুষ, তার কাছেও সব কথা খুলে বলা যায় না।

মাসখানেক হয়ে গেল শঙ্করী এসেছে, এখন সে আর রজতকে দেখে তেমন লজ্জা পায় না। এক এক সময় ঘোমটা খুলে রাখে। যদিও রজত ওর সঙ্গে এ পর্যন্ত একটাও কথা বলে নি, তবু দু'জনের চোখের দৃষ্টিতে খানিকটা পরিচয়ের ভাব ফুটে ওঠে।

সিঁড়ির নিচেই শঙ্করী রান্না করে। ওখানে প্রায় একটা ছোটখাটো সংসার পেতে ফেলেছে। তার দুটি সন্তানের মধ্যে একটির বয়েস বছর ছয়েক, অন্যটি দেড় দু'বছরের বেশি না। বাচ্চা দুটো সামনের চাতালে খেলা করতে যায়। একদিন শঙ্করীকে পেছনের উঠোনের খোলা কল থেকে স্নান করে আসতে দেখেছিল রজত। কিন্তু সে শঙ্করীর ভেজা শরীরের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল দ্বিতীয় বার তাকায় নি।

রজত নিজেকে পরীক্ষা করে। নিজের কাছে সে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। শঙ্করীর শরীরের দিকে সে লোভের দৃষ্টি দেয় না। সে জয়াকে ভালবাসে, অন্য নারীর প্রতি তার কোন আকর্ষণ এখনও পর্যন্ত নেই। তবে, শঙ্করীকে দিনে দু'বার অন্তত দেখার ইচ্ছেটা তার আছে ঠিকই। এ রকম কোন ভাস্কর্যের দিকেও সে বারবার তাকাত নিশ্চয়ই।

শঙ্করীও বোধহয় বুঝতে পারে রজতের দৃষ্টির মানে। তাই সে আর অযথা লজ্জা পায় না।

কোনদিন হয়তো রজত ওখান দিয়ে যাবার সময় হীরালালকে দেখতে পায়। দেয়াল ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হীরালাল ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আদর করে। আর মাঝে মাঝে কাশে। কাশির অসুখটা আর তার গেলই না!

রজতকে দেখলে হীরালাল ডেকে কিছু না কিছু কথা বলার চেষ্টা করে। রজতরা ছেড়ে দিলে ঐ ফ্ল্যাটটায় হীরালাল অন্য কোন ভাড়াটে জোগাড় করে আনবে। তাতে তার কিছু টাকা পাবার আশা আছে। সেই রোজগারের সম্ভাবনায় সে খুব উৎসাহিত। কিন্তু রজতের দাদা

এর মধ্যে মত বদলে ফেলেছে। সে ব্যাঙ্গালোরে বদলি হলেও এই ফ্ল্যাটের দখল ছাড়বে না। নিতান্ত নির্বোধ ছাড়া কলকাতা শহরে মাত্র দুশো পঁচিশ টাকা ভাড়ায় ফ্ল্যাট কেউ কি ছাড়ে? দাদা এখানে তার শ্যালককে ঢুকিয়ে দিয়ে যাবে।

রজত সে কথা এখন ভাঙে না হীরালালকে আশায় রাখে। সে সময় শঙ্করী ভেতর দিকে সরে যায় না, রজতের দিকে সরাসরি তাকায়। এর মধ্যে একটু রোগা হয়েছে শঙ্করী, কিন্তু তার রূপ ঝরে নি। সে যে কত সুন্দর, তা কি সে নিজে জানে? হীরালালের সেরকম কোন বোধ আছে বলে মনেই হয় না।

এই সিঁড়ির নিচের গহ্বরে আরও দু'পাঁচ বছর থাকলে, আরও দু'তিনটে বাচ্চা হয়ে গেলে শঙ্করীও হয়ে যাবে অতি সাধারণ। তখন অবশ্য রজত আর তাকে দেখতে আসবে না।

একদিন রজত একটা সাঙ্ঘাতিক দৃশ্য দেখে ফেললো।

সেটা অফিসের দিন হলেও রজত বেরোয় নি। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল বলে সে শুয়েছিল প্রায় সারা দুপুর। গলায় বেশ ব্যথা, সিগারেট খাওয়া উচিত না, সে সিগারেট রাখে নি নিজের কাছে, কিন্তু এক সময় আর পারা গেল না।

তখন বেলা সাড়ে তিনটে। এ বাড়ির ছেলে মেয়েরা স্কুল থেকে ফেরে নি, বাড়ি একেবারে নিঃসাড়। রবারের চটি পরে নেমে আসছিল রজত। পাজামার ওপর গেঞ্জি পরা, অবিন্যস্ত চুল, সে বেশ অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ এক তলার কাছাকাছি এসে সে থমকে গেল।

রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে সিঁড়ির নিচের জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। শঙ্করীর বুকে শাড়ি নেই। ব্লাউজ খোলা, এক হাত দিয়ে ধরে আছে সে নিজের একটি খোলা স্তন।

রজত প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে নি। এটা কি ব্যাপার হচ্ছে নিজেই নিজেকে আদর করছে শঙ্করী? ঐ স্তন, অমন

সুগোল, মসৃণ, ঘুঘু পাখির মত স্তন সত্যিকারের কোন নারীর হয় ?

রজতের সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠলো ! এই প্রথম সে যেন কোন নারীর নগ্ন বুক দেখছে। তা ঠিক নয়। আগে সে দেখেছে কয়েকবার, কিন্তু আগেকার সব অভিজ্ঞতা এই বুকের কাছে তুচ্ছ।

শঙ্করী একহাতে নিজের একটি স্তন চেপে ধরেছে, তারপর সে অন্য হাতে একটি পেতলের বাটি এনে তার নিচে রাখলো। ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে লাগলো দুধ।

এর আগে রজত দু'একবার দেখতে পেয়েছে যে শঙ্করী তার ছোট ছেলেটাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। তখন সে দেয়ালের দিকে ফিরে বসে, ব্লাউজ খোলা থাকলেও শাড়ি দিয়ে এমন ঢাকাঢুকি করা থাকে বলে বুক দেখা যায় না। কিন্তু আজ পুরো বুক খুলে সে বাটিতে স্তন্য দুধ রাখছে কেন ?

রজত দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দু'মিনিট, তার সারা শরীর ঝাঁঝাঁ করছে, আজ সে দেখছে পুরোপুরি লোভীর মতন। ঐ অপরূপ স্তনের দিকে তাকিয়ে শুধু সৌন্দর্য দর্শন নয়, সে ভোগ করছে যৌন রোমাঞ্চ। তার একবার মনে পড়লো জয়ার কথা। তবু সে সরে যেতে পারছে না। সে হেরে গেছে।

মুখখানা নিচু করে আছে শঙ্করী। তার একদিকে গাল, চিবুক, তার স্তনের ওপর আঙুল, সব মিলিয়ে একটা অবর্ণনীয় চিত্র, কোন ছবিতেও এরকম আঁকা দেখেনি রজত।

ওপর তলায় একটা দরজা খোলার শব্দে রজত আবার কেঁপে উঠলো। কেউ এসে পড়লে তাকে এখানে চোরের মতন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফেলবে। হ্যাঁ, অবিকল চোরের মতন।

রজত এবার জুতোর শব্দ করে তরতরিয়ে নেমে গেল, নিচে গিয়ে এই প্রথম সে শঙ্করীর দিকে চাইলো না। ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

সিগারেটের দোকানে গিয়ে প্যাকেটটা নিতে গিয়ে সে টের পেল, তখনও তার হাত কাঁপছে।

গেঞ্জি গায় দিয়ে তো রজত রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারবে না। তাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। তবু বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে একটা সিগারেট শেষ করলো।

ভেতরে ঢুকেও সে আর সিঁড়ির নিচের দিকে তাকাবে না ঠিক করেছিল, কিন্তু একটা শব্দ শুনে চোখ ঠিক চলে গেল সেদিকে।

শঙ্করী একটা পাথরের ওপর নোড়া দিয়ে কি যেন বাটছে। মনে হয় কোন শেকড় বাকড়। পাথরের ওপরটা সাদা হয়ে গেছে। শঙ্করী তার ওপর আবার পেতলের বাটি থেকে একটু দুধ ঢেলে দিল।

এখন শঙ্করীর ব্লাউজ বোতাম—আঁটা। শাড়ি ভাল করে বুকে জড়ানো, তবু যেন রজত আগেকার দৃশ্যটাই দেখছে। সে ওপরে উঠতে পারছে না।

ঘাড় ফিরিয়ে শঙ্করী দেখলো রজতকে। লজ্জা ভাবে হাসলো।

এর আগে কোনদিন কথা বলেনি রজত, আজ হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এলো একটা প্রশ্ন। ওটা কি করছো?

শঙ্করী ফিসফিসে গলায় বললো, দাওয়াই।

রজত আবার জিজ্ঞেস করলো, কিসের দাওয়াই?

শঙ্করী বললে, খাঁসিকা দাওয়াই!

রজত বুঝলো, স্বামীর জন্য কাশির ওষুধ বানাচ্ছে শঙ্করী। এই ওষুধের জন্য দুধ লাগে। এমনি দুধ কিনতে পারে না বলেই কি শঙ্করী বুকের দুধ মেশাচ্ছে? না, স্তনদুগ্ধই এই ওষুধের অনুপান?

রজতের মনে হলো, আহা, আমি যদি হীরালাল হতাম!

এক মুহূর্তের জন্য এরকম মনে হওয়া। এর কোন মূল্য নেই। ট্রেনে যেতে যেতে কোন একটা ছোট্ট, ছিমছাম স্টেশন দেখলে ইচ্ছে হয়, সারা জীবন এরকম একটা জায়গায় স্টেশনমাস্টার হয়ে কাটিয়ে দিলে বেশ হতো। কিংবা মোষের পিঠে চড়ে কোন সাঁওতাল বালককে নদী পার হতে দেখলে মনে হয়, আহা, আমার জীবনটা ওরকম হলো না

কেন? গ্রাম্য রথের মেলায় কাচের চুড়িওয়ালাকে দেখলেও এরকম মনে হয়। এই সবই বিলাসিতা। এরকম জীবন সত্যিই আমাদের দিলে আমরা নিতাম না।

জয়াকে যে ভালবাসে, সেই রজত মোটেই হীরালালের স্ত্রীর স্তনে মুখ দিতে চায় না।

শঙ্করী পাথরের ওপর এক মনে ঘষতে লাগলো সেই স্তন্য মেশানো শেকড়, সেদিকে চুম্বকের মতন দৃষ্টি আটকে গেছে রজতের। প্রায় জোর করেই যেন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে উঠে গেল ওপরে।

কিন্তু সারা বিকেল, সন্ধে সে বিদ্যুৎ ঝলকের মতন বারবার দেখতে লাগলো শঙ্করীর নিজের স্তনে নিজের হাত দেওয়ার দৃশ্য।

পরদিন হীরালালের সঙ্গে দেখা দরজার বাইরে। ফ্ল্যাটটার ব্যাপারে সে খুবই আগ্রহী। রজত তাকে তার দাদার সঙ্গে ভজিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। রজত নিজে শিগগিরই চলে যাচ্ছে, তার প্রায় সব ঠিক।

কথা বলার সময় সে লক্ষ করলো, হীরালাল একবারও কাশছে না। স্ত্রীর নিজের হাতে তৈরি ওষুধ খেয়ে ওর কাশি ম্যাজিকের মতন সেরে গেল? কি সেই আশ্চর্য শিকড়? কিন্তু এটা জিজ্ঞেস করা যায় না। রজত যে শঙ্করীর ওষুধ বানাবার প্রক্রিয়াটা দেখে ফেলেছে, এটা জানাতেই তার লজ্জা লাগবে।

জয়ার সঙ্গে সন্ধে সাড়ে ছটায় গঙ্গার ধারে রেস্তোরাঁটার সামনে দেখা করার কথা। আজও শরীরটা ভাল নেই রজতের, বেশ জ্বর জ্বর ভাব, আজ না গেলেই ভাল হয়। কিন্তু জয়াকে কিছুতেই ফোনে ধরা গেল না সারাদিন। কোন খবর দিতে না পারলে জয়া ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। একা একা ওখানে দাঁড়ানো কোন মেয়ের পক্ষে মোটেই ভাল নয়।

এক একদিন কোন কিছুই ঠিকঠাক হয় না। গঙ্গার ধারের রেস্তোরাঁটায় আজ এত অসম্ভব ভিড় কেন? বসবার জায়গা তো

নেই-ই, সামনে বেশ কিছু নারী পুরুষ অপেক্ষা করছে। রজত আর জয়া দু'জনেই এসেছে অফিস থেকে, বেশ ক্ষিদে পেয়ে গেছে, এখানে বসবে বলে আজ টিফিনও খায় নি। বাইরের ভেলপুরি কিংবা আলুর চপ জয়া একেবারেই খেতে চায় না। খাওয়ার ব্যাপারে সে খুঁতখুঁতে।

ওরা একটু দূরে সরে গিয়ে একটা রেলিং ধরে দাঁড়ালো। এর মধ্যে আবার বৃষ্টি পড়তে লাগলো গুঁড়িগুঁড়ি। জয়া ছাতা খুলে বললো, ভালই হলো, কাছাকাছি লোক থাকবে না। যা ভিড় হয় আজকাল এখানে !

এক ছাতার নিচে দু'জনে বেশ ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়। একটা ল্যাম্প পোস্টের আলো তির্যক হয়ে এসে পড়েছে জয়ার শরীরে। রজতের ডান বাহু ছুঁয়ে রইল জয়ার বুক, জয়া সরে গেল না।

রজতের হঠাৎ মনে পড়লো, সে আজও জয়ার নগ্ন বুক দেখেনি, কিন্তু অন্য একজনের দেখেছে। সে জয়ার বুকের দিকে তাকালো। একটুখানি আভাস। সে যদি জয়াকে বলে, তোমার ব্লাউজটা খুলে একবার দেখাবে ? জয়া অসম্ভব রাগ করবে। জয়ার সম্ভ্রমবোধ খুব বেশি। এ পর্যন্ত মাত্র গোটা পাঁচেক চুমু খেয়েছে রজত। কিন্তু জয়া তার সঙ্গে কোন নির্জন ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে চায় না।

শঙ্করীর বুকের সঙ্গে জয়ার বুকের তুলনা করতে চায় কেন রজত ? এটা তার পাগলামি নয় ? আর ঠিক পাঁচদিন বাদে সে নতুন ফ্ল্যাটে চলে যাবে, শঙ্করীকে সে আর কোনদিন দেখবে না। সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ঐ রকম দৃশ্য জীবনে এক আধবারই মানুষ দেখে। কেউ কেউ দেখেই না। শেকড়টা বাটছিল শঙ্করী, তার নাম জানা হবে না কোনদিন।

তবু, শঙ্করীর সেই নিজের বুকে হাত রাখা, সেই দৃশ্যটা অন্ধকার নদীর ওপর দুলছে। রজত দাঁড়িয়ে আছে জয়ার পাশে। সে দেখছে সেই দৃশ্য, এটা যেন সহ্য করা যায় না। এখন জয়া নিজের বুক খুলে দেখালে···। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

জয়া জিজ্ঞেস করলো, বন্ধুদের জন্য একটা হাউজ ওয়ার্মিং পার্টি দিতে হবে না? অনেকেই তোমাকে ধরবে।

রজত বললো, আমাদের রেজিস্ট্রি হয়ে যাক, তারপর একসঙ্গে....

জয়া একটু উদ্বিগ্নভাবে বললো, তুমি কাশছো? খুব কাশি হয়েছে, দেখছি....ওষুধ খেয়েছো কিছু?

রজত কোন উত্তর দিতে পারল না। মুখটা ফিরিয়ে নিল।

কিছু কিছু কথা সারা জীবনেও জয়াকে জানানো যাবে না।

শিকার কাহিনী

মেয়েটিকে দেখলেই বোঝা যায়, সে আগে কখনো কলকাতায় আসেনি।

হাওড়া স্টেশনে সকাল পৌনে দশটায় ভিড়ের মধ্যে সে স্পষ্টতই একা। একটা হলদে ডুরে তাঁতের শাড়ি পরা। কপালে লাল টিপ। সিঁথিতে অনেকখানি সিঁদুর। তার বয়েস তেইশ চব্বিশের বেশি না। পাতলা দোহারা। একটু বেশি লম্বা বলে হিলহিলে ভাব আছে। তার চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রথম দেখা শহরের ছবি!

অফিস টাইমে সবাই ব্যস্ত। হুড়োহুড়িতে মত্ত। এমন সময় সিঁথিতে অতখানি সিঁদুর দেওয়া কোনো রমণীকে মানায় না। সে জনস্রোতে ধাক্কা খাচ্ছে। কেউ কেউ ইচ্ছে করে তাকে খোঁচা মারছে। সে স্রোতের ফুলের মত দুলছে এদিক ওদিক।

তার হাতে একটা ছোট চটের থলি, অন্য হাতে একটি পোস্ট কার্ড।

সে একজন মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাকুলভাবে বলছে, ও দিদি, ও দিদি!

সবাই কাঁটায় কাঁটায় সময় ধরে ট্রেনে চাপে। হাওড়ায় নেমেই ছুটে গিয়ে বাসের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়। নইলে অফিসে লেট মার্ক পড়ে। এমন কি কারুর একটা বাজে হাতে-লেখা পোস্টকার্ড পড়ার সময় আছে?

তবু কেউ কেউ দাঁড়ায়। সমস্ত শরীরটা অস্থিরতায় দুললেও সহানুভূতির সঙ্গে মেয়েটির কথা শুনতে চায়। শুনে, অসহায় ভাব করে।

পোস্টকার্ড টায় এক-পিঠে একটা ঠিকানা লেখা আছে। তারা-মা

কেমিক্যাল ওয়ার্কস। ৩।২, গণেশ সাহা লেন। কলিকাতা।

এরকম একটা অজ্ঞাত রাস্তা কে চিনবে? পোস্টাল জোন পর্যন্ত লেখা নেই।

একজন মধ্য বয়স্কা, ফরসা, গালভারি চেহারার মহিলা সমস্ত পোস্ট-কার্ডটি পড়লেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একলা এসেছো? কলকাতায় তোমার আর কেউ চেনা নেই?

মেয়েটি দু' দিকে মাথা নাড়লো।

মহিলা বললেন, এ রকম হুট করে কি কেউ আসে? কলকাতা শহর .. বড় কঠিন জায়গা!

মহিলাটি বেশ জোরে জোরে কথা বলছেন, তাঁর চেহারার একটা আকর্ষণ আছে। তাই তাঁকে ঘিরে ছোটোখাটো একটা ভিড় জমে যায়।

মহিলাটি অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা কেউ গণেশ সাহা লেন চেনেন?

একজন বললে, ভবানীপুরে বোধ হয়। আর একজন বললে, বাগবাজারে। আর একজন বললো, বড়বাজারে গণেশ দাশ লেন আছে একটা। আর একজন বললো, কলকাতাতে নয়, তারা-মা কেমিক্যাল ওয়ার্কস তো দক্ষিণেশ্বরে।

মহিলাটি রাগ রাগ চোখ করে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেউ এই মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে পারবেন?

অমনি ভিড় পাতলা হয়ে গেল।

ফরসা মহিলাটি এই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের বউটিকে বললেন, আমার হাতে তো একদম সময় নেই ভাই। না হলে আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করতাম। তুমি বরং পুলিশের কাছে গিয়ে খোঁজ করো।

মহিলাটি পোস্টকার্ডটি ফেরত দিয়ে এগিয়ে গেলেন। একটুখানি গিয়ে আবার পেছন ফিরে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও।

মেয়েটি তবু মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইলো। পুলিশ শব্দটি তাকে

কাঁপিয়ে দিয়েছে। জন্ম থেকেই সে জেনে এসেছে, পুলিশের কাছাকাছি যেতে নেই। প্রজাপতি যেমন চড়াই পাখির কাছে যায় না, চড়াই পাখি তেমন বেড়ালের কাছে যায় না।

কলকাতার পুলিশ কি আর অন্যরকম হবে?

একটা ট্রেন পৌঁছে গেছে। পরবর্তী ট্রেন একটু পরে আসবে। মাঝখানের সময়টায় প্লাটফর্ম একটু ফাঁকা হয়।

তখন পাজামার ওপর নীল শার্ট পরা একটা লোক, চিমসে চেহারা, মুখখানা ছুঁচোলো ধরনের, একটা সিগারেট টানতে টানতে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি বিষ্টুপদকে খুঁজতে এসেছো?

মেয়েটি আবার কেঁপে উঠলো। কেউ যেন তার হাতে চাঁদ গুঁজে দিল এইমাত্র। এই লোকটা তার স্বামীকে চেনে।

লোকটি বললো, তুমি বিষ্টুদার বউ?

মেয়েটি এবার জোরে জোরে মাথা নাড়লো।

লোকটি আবার বললো, তারা-মা কেমিক্যালে বিষ্টু তো আমার সঙ্গেই কাজ করে। বিষ্টু বলছিল বটে, ছ'মাস বাড়ি ফেরা হয়নি। আমার বউটা নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে। বিষ্টু গত হপ্তায় তোমাকে একটা চিঠি লিখেছে, তুমি পাওনি?

মেয়েটি বললো, কই, না তো!

লোকটি বললো, বিষ্টু কখনো বাড়ি ভাড়া করতে পারেনি, তাই তোমাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারেনি। আমার সঙ্গেই থাকে। তা বলে তুমি হুট করে চলে এলে? কানের ফুল দুটো কিসের, রূপোর? হাতের লোহাটা সোনা দিয়ে বাঁধানো, না পেতলের? আরে দিদি, এই সব গয়না পরে কোনো মেয়েছেলে একা একা কলকাতা শহরে আসে? এ কেমন জায়গা তা তো জানো না! পদে পদে বিপদ? ভাগ্যিস, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চলো!

মেয়েটি অসহায় ভাবে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবো? আপনি আমাকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে যাবেন?

লোকটি বললো, হাওড়ায় শালকেতে আমাদের জায়গা। তার পাশেই আমার বাড়িতে বিষ্টু থাকে। তোমাকে দেখে বিষ্টু একেবারে অবাক হয়ে যাবে! তুমি এমন ভাবে চলে এসেছো বলে বকুনিও দেবে তোমাকে। যাক গে, সে তোমরা বুঝবে!

লোকটির সঙ্গে এবার নিশ্চিন্তে এগোলো মেয়েটি। তার স্বামী তাকে বকুনি দেয় তো দিক! সেও কম বকবে না। ছ'মাস আগে এই একখানা পোস্টকার্ড এসেছিল তারপর মানুষটার আর কোনো পাত্তা নেই।

যেতে যেতে লোকটি বললো, আমার নাম ঘনশ্যাম। বিষ্টু আমার কাছে সব কথা বলে। তোমার জন্য ওর খুব কষ্ট। তোমার নাম কী যেন! বিষ্টু বলেছে, ভুলে যাচ্ছি।

—সাবিত্রী। সাবিত্রী মাইতি।

—ও হ্যাঁ, সাবিত্রী। সকালে কিছু খেয়েছো? মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, খাওয়া হয়নি কিছু। সঙ্গে পয়সাকড়িও কিছু নেই নিশ্চিত। ছি, ছি, এভাবে কলকাতায় এসে পড়লে। আমার সঙ্গে দেখা না হলে কী বিপদেই যে পড়তে! নাও, একটু চা আর বিস্কুট খেয়ে নাও।

সাবিত্রীর চোখে জল এসে গেল। সারা রাস্তা সে ভয়ে ভয়ে এসেছে। ট্রেনেও দুটো লোক তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল। তবু সে এসেছে বেপরোয়া হয়ে। এখন একজন মানুষের মুখে এসব সহৃদয় কথা শুনলে তার কান্না আসবে না?

চা ও একখানা নোনতা বিস্কুট খেয়ে ওরা বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে। ভিড়ের জায়গাগুলো এড়িয়ে, পেছন দিকের ব্রিজের কাছে এসে একটা রিকশ ডাকলো ঘনশ্যাম। সাবিত্রীকে আগে তাতে ওঠাল। তারপর সে রিকশয় পা দিতে যাবে, এমন সময় একটা ঘটনা ঘটলো।

একটু দূর থেকে একজন হেঁড়ে গলায় ডাকলো, অ্যাই লট্‌কা!

সেই ডাক শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ঘনশ্যামের। মুখ ঘুরিয়ে আহ্বানকারীকে দেখতে পেয়েই সে এক মুহূর্ত দেরি করলো না। পাঁই

পাঁই করে ছুট দিল প্রাণপণে। এঁকে বেঁকে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল কোথায়।

যে ডেকেছিল, তার পরনে একটা কালো রঙের প্যান্ট, ধূসর গেঞ্জি, গলায় একটা রুমাল বাঁধা। এক হাতে লোহার বালা, মাথার চুল তেল-চকচকে। বেশ মজবুত শরীর।

সে কাছে এসে সাবিত্রীকে আপাদমস্তক দেখল, হুঁ! এই মেয়ে, তুমি ওর সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিলে?

সাবিত্রীর বুক ঢিপঢিপ করছে। ওই লোকটা তার স্বামীর বন্ধু, তাকে তার স্বামীর কাছে পৌঁছে দেবে বলেছিল, তবু হঠাৎ পালালো কেন? এবার তার কী হবে?

সাবিত্রী বললো উনি আমাকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন! ঘনশ্যামবাবু কোথায় গেলেন?

মজবুত চেহারার ছোকরাটি বললো, ঘনশ্যাম? সাত জন্মে ওর নাম ঘনশ্যাম নয়। ওর নাম লটকা। ও ব্যাটা তো একটা শেয়াল! প্ল্যাটফর্মে ঘুরঘুর করে! ও তোমাকে কোথাও পৌঁছে দেবে বলেছিল? হা-হা-হা-হা!

হাসি থামিয়ে সে বললো, ব্যাটাকে ধরতে পারলে মাথা গুঁড়িয়ে দিতুম। আমার টাকা মারার তাল! ওগো মেয়ে, ও তোমাকে খাবার মতলবে ছিল!

সাবিত্রী বললো, না, না, উনি আমার স্বামীকে চেনেন। নাম বললেন, এক সঙ্গে কাজ করেন!

—লটকা কাজ করে? ছোঁক ছোঁক করা ছাড়া আর কোনো কাজ ও জানে? তোমার হাতে ওটা কী?

—আমার স্বামীর চিঠি!

—ওই লটকা ব্যাটা কোনো ফাঁকে উঁকি মেরে চিঠিখানা দেখে নিয়েছে। তাই থেকেই বানিয়েছে যে তোমার স্বামীকে চেনে। ছেঃ! ব্যাটাকে ধরা গেল না। দেখি, ঠিকানাটা দেখি—

পোস্টকার্ডটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে সে বললো, তারা-মা কেমিকেল ! গণেশ সাহা লেন। শিবপুরে। আমাদের পাড়াতেই। দ্যাখা যাক, সেখানে তোমার মন্নদকে পাওয়া যায় কিনা। সঙ্গে বসো !

এক লাফ দিয়ে রিকশয় উঠে বসে রিকশওয়ালাকে বললো, এই ব্যাটা, জোরে ছুটবি ! টিকিস টিকিস করলে লাথি খাবি !

রিকশাটা ছুটতে শুরু করতেই যুবকটি বললো, ভয় নেই। আমি তোমায় ভালো জায়গায় রাখবো !

সাবিত্রি বললো, আমি আমার স্বামীর কাছে যাবো।

তা তো যাবেই। ওই লোকটার হাতে পড়লে কোনদিন পৌঁছতে পারতে না ; সোজা তোমাকে আসল পাড়ায় নিয়ে গিয়ে তুলতো।

—আমার স্বামীকে আপনি চেনেন ?

—চিনি না। কিন্তু খুঁজে বার করতে কতক্ষণ। ঠিকানা যখন আছে। আজ না হয় কাল পাওয়া যাবে, কাল না হয় পরশু !

—আমি আজকেই যাব !

—যাবে, যাবে ! ঠিক হয়ে বসো। কান্নাকাটি করো না কোনো লাভ নেই। তুমি সিগ্রেট খাবে ?

—আমি খাই না !

ব্রিজ পার হবার পরেই বৃষ্টি নামলো। রিকশর ছাউনি তুলে দিতে হল। ছোকরাটি তখন তার একটা হাতে সাবিত্রির কোমর বেষ্টন করলো। তারপর বেশ ভাব দিয়ে বললো, গ্রাম থেকে চলে এসেছো, ভালো। গ্রামে কি মানুষ থাকে ? যত সব ক্যাংলা পার্টি ! আমিও চলে এসেছি।

—একটু সরে বসুন। গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন ?

—তবে কি তোমার বুকে হাত দেবো, সোনা !

ঠিক এই সময় এমন ভাবে একটা জিপ এসে থামলো সামনে যে রিকশটা উলটে যেত আর একটু হলে।

একজন পুলিশ অফিসার ঝট করে জিপ থেকে নেমেই রিভলভার

তুলে বললেন, এই ছোটেলাল, নাব নাব। এদিক ওদিক করলেই কিন্তু খোপরি উড়িয়ে দেবো!

জিপ থেকে আরও একজন কনস্টেবলও নেমেছে। তার হাতে বেঁটে লাঠি।

ছোটেলাল একবার কোমরের কাছে লুকানো ছুরিতে হাত বুলোলো, কিন্তু বার করলো না। এই রজত দারোগা কতটা হিংস্র সে ভালো করেই জানে, সত্যি সত্যি গুলি চালিয়ে দিতে পারে। দু'মাস একে কোনো টাকা দেওয়া হয়নি। রোজগারপাতি যে এখন কম, তা এই দারোগা বুঝবে না।

দারোগাটির পেটানো চেহারা, চওড়া বুক, সরু মধ্যদেশ। চোখ দুটি অত্যুজ্জ্বল। সে বললো, হারামজাদা, আমার হাত এড়িয়ে পালাবি ক'দিন? আমি ইচ্ছে করলে ধরতে পারিনি, এমন কালপিট জন্মায়নি আজও! সঙ্গে আবার ভালো চেহারার মেয়ে জুটিয়েছিস! দিন-দুপুরে মেয়ে নিয়ে রিকশয় ঘুরছিস, তোর পাখা গজিয়েছে দেখছি!

কনস্টেবলটিকে সে বললো, ওর হাত দুটো পিছ মোড়া করে বাঁধো। দেখো, সাবধান, এটা একেবারে নেকড়ের মতন শয়তান। ছুরি থাকে, বার করে নাও আগে।

ছোটেলাল বললো, বড়বাবু, এই মেয়েছেলেটি ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছিল না, তাই ওকে পৌঁছে দিচ্ছিলুম!

দারোগাটি মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে প্রবল জোরে হেসে উঠলো।

তারপর বললে, তুই পৌঁছে দিচ্ছিলি? অ্যাঁ? কেন, তোর বুঝি খিদে নেই?

ছোটেলাল বললে, বড়বাবু, আপনি তবে ওকে নিন। আমাকে ছেড়ে দিন এবারটি মতন!

দারোগা গর্জন করে বলে উঠলো, চোপ! ওর কথা তোকে চিন্তা করতে হবে না!

তারপর ছোটেলালের চুলের মুঠি ধরে বললো, ওঠ গাড়িতে! এবার

তোর মাথা যদি ভেঙে না দিই তো আমার নাম মাধব সরদার নয়!

ছোটেলালকে জিপের মধ্যে ঠেলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বেশ নরম গলায় দারোগাটি সাবিত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কবে থেকে লাইনে নেমেছো? আগে তো দেখিনি!

সাবিত্রী সিঁটিয়ে গিয়ে বললো, বাবু, আমি পুরুলিয়া থেকে এসেছি, আমার স্বামীকে খুঁজতে। এই যে আমার স্বামীর চিঠি!

পোস্টকার্ডটি হাতে নিয়ে দারোগাটি সব পড়লো। তারপর বললো, ঠিক আছে। একটা কিছু ব্যবস্থা হবে যাবে। ওঠো, জিপে এসো!

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসলো দারোগা, তার পাশে বসালো সাবিত্রীকে। সাবিত্রী কখনো এরকম গাড়িতে চড়েনি।

একটু পরে দারোগাটি জিজ্ঞেস করলো, তোমার স্বামী তোমাকে একলা গ্রামে ফেলে কলকাতায় চাকরি করতে এল?

সাবিত্রী বললো, এখান থেকে কয়েকজন বাবু গিয়েছিল আমাদের গ্রামে। তারা ওকে বললো, কলকাতায় চাকরি দেবে। ভালো মাইনে, কারখানায় কাজ। বাবুরাই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল।

—হুঁ, বাবুরা সঙ্গে করে নিয়ে এল। কী রকম বাবু কে জানে। তোমাকে একা রেখে এল?

—ওখানে আমার এক বুড়ি পিসিমা থাকে। ও বলেছিল, এ মাসের মধ্যে আমাকে পুরুলিয়া থেকে কলকাতায় নিয়ে আসবে!

—তারপর আর পাত্তা নেই? এই একটা মাত্র চিঠি লিখেছে।

—আমি দু'খানা পত্তর পাঠিয়েছি, কোনো উত্তর পাইনি।

—হুঁ, তাহলে কলকাতায় অন্য কোনো মেয়ের পাল্লায় পড়ে মজেছে। তোমাকে ভুলে গেছে।

—না গো, বাবু, না না সে তেমন মানুষই নয়।

—কে কখন বদলে যায়, তা কি বলা যায়? এ তো আর গ্রাম নয়, শহর বড় মজার জায়গা। তা তুমি চলে এসে ভালো করেছো। গ্রামে থাকলে তো খেতেই পেতে না। শুধু শুধু এমন শরীরটা নষ্ট করতে।

—বাবু আমার এখন কী হবে ?

—ব্যবস্থা হয়ে যাবে, ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে !

—থানার কাছে এসে জিপটি থামতেই দারোগাটি কনস্টেবলকে বললো, তুমি ছোটেলালকে গারদে নিয়ে যাও। একটু দলাই মলাই করো। আমি আসছি। এই মেয়েটাকে কোনো আশ্রয় টাশ্রমে পৌঁছে দিতে হবে তো !

ছোটেলাল জিপ থেকে নামবার পর ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, আশ্রম না ছাই। ওগো, মেয়ে, তুমি এবার বাঘের খপ্পরে পড়লে !

জিপের ড্রাইভার এবং কনস্টেবল দু'জনেই গোঁফের ফাঁকে হাসলো।

জিপ ছাড়তেই সাবিত্রী বললো, আমি আশ্রমে যাবো না। আমি স্বামীর কাছে যাবো।

দারোগা বললো, যাবে, যাবে, যেখানেই যাও, অত তাড়াহুড়ো কিসের ? পুলিশের হাতে পড়েছো ! এজাহার দিতে হবে না ? ড্রাইভার, আগে গেস্ট হাউজ চলো।

এই থানার মধ্যে কয়েকটা জুট মিল আছে। তার মধ্যে একটির রয়েছে চমৎকার গেস্ট হাউজ। গঙ্গার ধারে, নিরিবিলি। সব রকম খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা। দারোগাবাবু সে গেস্ট হাউজ যখন তখন ব্যবহার করতে পারে।

বাঘের যেমন স্বভাব, দেরি সহ্য হয় না। খিদে পেয়েছে, সামনে খাদ্য তৈরি, সন্ধের অন্ধকার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না। তাকে বাধা দেবারও কেউ নেই। বাঘকে কে না ভয় পায়।

জিপটা এসে থামলো বাগান বাড়ির পেছন দিকে। সেখানে একটা ছোট দরজা। দারোগাকে দেখে একজন আর্দালি সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দিল। সাবিত্রী ভয়ের চোটে নামতে চাইছিল না, তাকে টেনে হিঁচড়ে আনা হল ভেতরে।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দারোগা তার ঘাড় কামড়ে ধরে গরগর করতে করতে বললো, চেঁচাবি না, হারামজাদি, তাহলে এক্ষুণি

শেষ করে দেবো। চুপচাপ থাক, দু'তিনদিন পর স্বামীর কাছে পৌঁছে যাবি।

দোতলার বড় ঘরটির দরজা ঠেলে খুলতেই অন্য দৃশ্য!

লোকে বলে, এক অরণ্যে বাঘ আর সিংহ একসঙ্গে বাস করে না। কিন্তু শহরে ও নিয়ম খাটে না। এখানে বাঘেরও বাবা আছে, বাঘ আর সিংহ দিব্যি সহাবস্থান করতে পারে।

এই ঘরটার সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে সাত খানা জুট মিলের মালিক দুর্জয় সিং। বিশাল চেহারা। চোখ দুটো ভাটার মতন। মাথায় পরচুলা। সে ঘনঘন নিশ্বাস ফেলচে।

দারোগাকে দেখেই দুর্জয় সিং হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, এই যে দারোগাবাবু, আপনি আমার দু'জন লোককে অ্যারেস্ট করেছেন? আপনাকে প্রতি মাসে মোটা খাওয়াচ্ছি, তাতে হয় না। মন্ত্রীদের দিয়ে টেলিফোন করতে হবে?

দারোগা খানিকটা কুঁকড়ে গিয়ে বললো, আপনার লোককে ধরেছে? কই, আমি জানি না তো।

দুর্জয় সিং আবার ধমক দিয়ে বললো, আপনি জানেন না? তাদের এমনি ফটকে পুরলো? বাঁকুড়ায় ট্রান্সফার হতে চান, না সাসপেণ্ড হতে চান!

দারোগা বললো, নিশ্চই ভুল করে ধরেছে। আমি দেখছি। একটু পরেই থানায় গিয়ে দেখছি।

দুর্জয় সিং বললো, একটু পরে কেন, এক্ষুণি যান? ডিউটি ফেলে রাখবেন না! এখানে এখন কী করতে এসেছেন?

দারোগা বললো, এই মেয়েটা স্যার, হারিয়ে গেছে। ছোটেলালের খপ্পরে পড়েছিল। এর সঙ্গে ক্রিমিন্যালদের কোনো কানেকশান আছে কি না একটু জেরা করে দেখতে হবে। সেইজন্যই নিরিবিলিতে··· বেশিক্ষণ লাগবে না, বড় জোর চল্লিশ মিনিট।

দুর্জয় সিং এই প্রথম সাবিত্রীকে দেখলো। উঠে এসে, একবার

সামনে, একবার পেছনে, একবার থুতনি তুলে।

তারপর বললো, বাঃ এ যে একেবারে ফ্রেস মাল দেখছি। কোথায় পেলে ?

—আজই ট্রেন থেকে নেমেছে।

—বা-বা-বা-বা ! আজকাল যতই টাকা খরচ করুন, ফ্রেস কিছুতেই পাওয়া যায় না। সবই কোল্ড স্টোরেজ ডিপ ফ্রিজের মাল। জানেন তো, যতই খুবসুরত হোক, আর এসব পোশাকের বাহার থাকুক, ফ্রেস জিনিসের স্বাদই আলাদা। এখানে একে আপনি জেরা করবেন ?

—হ্যাঁ, স্যার।

—আপনি থানায় গিয়ে ডিউটি করুন। আমি জেরা করছি। আজ আমার মনমেজাজ ভালো নেই। দেখি, এই ফ্রেস জিনিসটি খেলে আমার ভবিষ্যৎ ঠিক হয় কী না।

দারোগাটি দুর্জয় সিং-এর চোখের দিকে তাকালো। নিজের লেজটা আছড়াতে আছড়াতে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে গরগর করতে করতে বললো, না একে আমিই জেরা করবো। বলছি তো বেশিক্ষণ লাগবে না।

দুর্জয় সিং হেসে বললো, ঠিক আছে, একদিনের জন্য জামিন তো দিতে পারেন ? একদিন জামিন রাখতে কত লাগবে বলুন। তারপর কাল আপনি যত ইচ্ছে জেরা করবেন। কত লাগবে, কত ?

পকেট থেকে এক মুঠো একশো টাকার নোট বার করে সে ছুঁড়ে দিল দারোগার বুকে। নোটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে দারোগা একবার তাকালো সাবিত্রীর দিকে, আর একবার দুর্জয় সিং-এর দিকে। তারপর ঠোঁট চাটতে চাটতে পিছিয়ে গেল এক পা এক পা করে।

দুর্জয় সিং বললো, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যান।

সিংহ সমাজে একটা নিয়ম আছে। পুরুষ সিংহরা বসে থাকে এক জায়গায়, সিংহিনীরা শিকার করে। সিংহিনী সব জোগাড় করে দেয়, সিংহ দয়া করে খায়। তারপর সিংহিনীই সিংহের গা চেটে পরিষ্কার করে দেয়।

এখানেও সেরকম একটা কিছু ঘটলো।

একটা এয়ারকণ্ডিশান্‌ড গাড়ি এসে থামলো প্রধান দরজায়। খুব ফরসা, স্থূলাঙ্গিনী, চোখে কালো চশমা পরা এক মহিলা সেই গাড়ি থেকে নেমেই ধুপধাপ করে উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। একজন আর্দালি কিছু বলতে এল তাকে, সে এক ঠেলায় সরিয়ে দিল তাকে। তারপর ওপরে এসে ধাক্কা মেরে খুলে ফেললো দরজা।

দুর্জয় সিং তখন সবেমাত্র সাবিত্রীর আঁচলটা খুলে ফেলেছে, ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্জন করে বললো, কে?

স্থূলাঙ্গিনী মহিলাটি তা গ্রাহ্য না করে সাবিত্রীর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললো, এ কে?

দুর্জয় সিং কোনো উত্তর দিল না।

মহিলাটি নাক কুঁচকে বললো, ছিঃ, এই তোমার রুচি হয়েছে? অ্যাংলো মেয়ে, বম্বের ফিল্‌ম অ্যাকট্রেস, অ্যামেরিকান হিপি, কলেজে পড়া বাঙালি মেয়ে, এসব কোনো কিছুতেই আমি আপত্তি করি না। খাও না, যত ইচ্ছে খাও। তা বলে এই নোংরা, গরিব, গাঁইয়া চাই তোমার? এর কত, কোন্ রোগ আছে তার ঠিক কী? ছি ছি ছি ছি, তুমি খানদানি মুসলমান, পাহাড়ী মেয়ে, অফিসারের বউ কী চাও বলো? এটাকে দূর করে দাও।

তারপর পা থেকে চটি খুলে সাবিত্রীকে মারতে মারতে বলতে লাগলো, বেহুদা, রেণ্ডি কাঁহিকা! দূর হয়ে যা! মর, তুই মর। তোকে শিয়াল-কুকুরে খাক! তুই এসেছিস সিংহের গুহায়।

মার খেয়ে সাবিত্রী মাটিতে পড়ে যেতেই স্ত্রী লোকটি হাঁক দিল, আর্দালি, এই রেণ্ডিটাকে অনেক দূরে মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসো।

নদীর ধারে, একটা আবর্জনার স্তূপের ধারে বসে সাবিত্রী এখন অঝোরে কাঁদছে। শুধু কেঁদেই চলেছে। সে এখন কোথায় যাবে, তা

জানে না। এরপর কী।

কোনো কবি হলে এই জায়গায় হয়ত লিখতেন, এক সময় সাবিত্রীর প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মুক্তো হয়ে ঝরতে লাগলো, যাদের হৃদয়ে পরিতাপ থাকে, তারাই শুধু দেখতে পায় সেই মুক্তো, তারা হাত জোড় করে সাবিত্রীর সামনে এসে বসলো।

কোনো পেশাদার প্রগতিশীল হলে বলতেন, সাবিত্রীর চোখের জলের ফোঁটাগুলো আসলে এক একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। ক্রমশ সেই সব অগ্নি স্ফুলিঙ্গ থেকে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন, সেই আগুন পুড়িয়ে ছারখার করে দিল দুর্জয় সিংহের মতন অত্যাচারীদের।

কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটলো না। সাবিত্রী শুধুই অসহায় ভাবে কেঁদে চলেছে।

গল্প লেখকের মুশকিল, এভাবে গল্প শেষ করা যায় না। ধরা যাক, অন্য একজন পুলিশ অফিসার, কিছু কিছু পুলিশ তো সৎ ও ভদ্র থাকতেই পারে, তাদের একজন সাবিত্রীকে পৌঁছে দিল তার স্বামীর কাছে। তাহলে কিন্তু সেটা গল্প হবে না। কিংবা এক সহৃদয় ভদ্রলোক কিংবা তরুণ আদর্শবাদী সাবিত্রীকে যত্ন করে তুলে দিল পুরুলিয়ার ট্রেনে। বাস্তবে এরকম ঘটে, কিন্তু ছাপার অক্ষরে পড়লে সবাই বলবে, বাজে গল্প।

সুতরাং সাবিত্রী ওখানেই বসে থাক, কাঁদুক।

শুধু অসমাপ্ত গল্পের অস্বস্তিতে আর সাবিত্রীর কান্নার শব্দে লেখকের একটা দিন মন-খারাপ অবস্থায় কাটবে।

সূর্যকান্তর প্রশ্ন

নার্সিং হোমের খাটে শুয়ে সূর্যকান্ত কী ভাবছেন এখন ?

সাদা ধপধপে চাদরের ওপর সূর্যকান্তর লম্বা শরীরটা যেন পুরো খাট জুড়ে আছে। চোখ বোঁজা। একটা হাত বুকের ওপর রাখা। একটু দূরে জানলার ধারে বসে আছে একজন নার্স। ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল সূর্যকান্তকে, কিছুক্ষণ আগে তিনি খানিকটা ছটফট করেছেন। এখন তিনি ঘুমিয়ে না জেগে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মমতা কাল সারারাত সূর্যকান্তর শিয়রের কাছে জেগে বসেছিল। এখন তাকে জোর করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটু বিশ্রাম নেবার জন্য। আর কারুকে এখন এ ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। দরজার বাইরে থেকে অনেকেই উঁকি মেরে দেখে যাচ্ছে। নার্সিং হোমের বাইরে বেশ ভিড়। দূর দূর থেকে অনেকে ছুটে আসছে সূর্যকান্তর খবর নেবার জন্য।

সূর্যকান্তর বয়েস বাহান্ন, বেশ নিটোল স্বাস্থ্য, লম্বা, মেদহীন শরীর। কিছুদিন আগে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, অন্য কোনো নেশা নেই, এককালে খেলাধূলোর ঝোঁক ছিল। এখনও প্রায় শীতকালে ব্যাডমিণ্টন খেলেন। তবু এরকম একটি কাণ্ড ঘটে গেল।

খাদিমগঞ্জ থেকে একটা জিপে ফিরছিলেন সূর্যকান্ত। সারাদিন ধরে ধকল গেছে খুব। দুপুরে ভালো করে খাওয়াও হয়নি, সন্ধ্যেবেলা হেড়োডাঙ্গায় পৌঁছে সত্যনারায়ণ পুজোর সিন্নি খাওয়ার কথা। সূর্যকান্ত পরিশ্রম করতে পারেন প্রচণ্ড, তাঁর সঙ্গের লোকেরাও মেতে থাকে, খিদে-তেষ্টায় কথা জানায় না।

পৌষ মাসের অপরাহ্ণ, আকাশের আলো মিলিয়ে যায় দ্রুত।

রাস্তার দু'পাশে খোলা মাঠ ধূ ধূ করছে, পাতলা কুয়াশার মতন নেমে আসছে অন্ধকার। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

সূর্যকান্ত বসেছিলেন জিপের পেছনে। সাধারণত তিনি সামনের সীটেই বসতে ভালোবাসেন, কখনো কখনো নিজেই জিপ চালান। কিন্তু বাবলু আর জয়দীপ কিছুতেই তাঁকে সামনে বসতে দেবে না। দু'দিন আগেই একটা নির্জন রাস্তায় তাঁর জিপ আটকাবার চেষ্টা হয়েছিল, হঠাৎ দমাদ্দম করে এসে পড়েছিল পাথর। এর আগেও মান্নু দত্তর লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে দু'বার। সূর্যকান্ত ভয় পান না, কিন্তু বাবলু-জয়দীপরা ঝুঁকি নিতে চায় না। থানা থেকে একজন বডিগার্ড দেওয়া হয়েছে, বন্দুক নিয়ে সে বসে আছে ড্রাইভারের পাশে।

চলন্ত গাড়িতে বাবলু আর জয়দীপ নানান কথা বলে যাচ্ছে, সূর্যকান্ত চুপ করে শুনছিলেন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কিল মারছিলেন। নিজের বুকে। কিসের যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। খানিকটা বাতাস যেন আটকা পড়ে গেছে বুকের মধ্যে কিছুতে বেরুতে পারছে না। এরকম তাঁর কখনো হয়নি আগে।

কথার মাঝখানে হঠাৎ তিনি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ছাখ তো বাবলু, আমার জ্বর এসেছে নাকি?

বাবলু হাতটা ছুঁয়ে বললেন, কই না তো। গা তো গরম নয়।

তারপর সে সূর্যকান্তর কপালে হাত রেখে তাপ অনুভব করতে গিয়ে চমকে উঠে বললো, এ কী সূর্যদা, আপনি ঘামছেন?

সূর্যকান্ত বললেন ঘামছি তাই না? মাঝে মাঝে শরীরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে, ঠিক জ্বরের মতন, তারপরেই আবার ঘাম হচ্ছে।

জয়দীপ বললো, আমার তো শীত শীত লাগছে। এর মধ্যে আপনার ঘাম হবে কেন?

বাবলু বললো, পরপর দু'রাত তো ঘুমই হয়নি। রাত দুটো-আড়াইটেয় শুয়েই আবার ভোর পাঁচটায় ওঠা। সূর্যদা, আজ রাত

দশটায় শুয়ে পড়বেন। ঘুম চাই ভালো করে না হলে খাটবেন কী করে ?

সূর্যকান্ত বললেন, হ্যাঁ, আজ ঘুমোবো।

খানিক বাদে সূর্যকান্ত আবার বললেন বড্ড জলতেষ্টা পাচ্ছে রে। গাড়িতে কি জলের বোতল-টোতল আছে ?

বাবলু আর জয়দীপ পরস্পরের দিকে তাকালো। গরমকাল নয়, তাই গাড়িতে জল রাখার কথা ওরা ভাবেনি।

জয়দীপ বললো, আর মাইল সাতেক দূরে কমলাপুর, সেখানে গিয়ে খাবেন।

সূর্যকান্ত বুক চেপে ধরে বললেন, তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে রে। অতক্ষণ থাকতে পারবো না। গাড়িটা এখানে থামাতে বল তো !

এই মাঠের মধ্যে কোথায় জল পাওয়া যাবে ? নালা-ডোবা থাকলেও তো সেই জল পান করা যাবে না !

গাড়ি চালাচ্ছে পরিতোষ, সে বললো সামনে একটা কুড়ে দেখা যাচ্ছে, আলো জ্বলছে, ওখানে থামাবো।

সূর্যকান্ত বললেন, হাঁ, থামা।

মাঠের মাঝখানে জিপ থামলে হঠাৎ মান্নু দত্তর লোকেরা এসে হামলা করবে কিনা, তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেল বাবলু-জয়দীপরা। কিন্তু সূর্যকান্ত প্রায় ছটফট করছেন তৃষ্ণায়।

জিপটা থামতে জয়দীপ বললো, আপনি বসুন সূর্যদা, আমি জল আনছি।

সূর্যকান্ত বললেন, তোকে যেতে হবে না। আমি খেয়ে আসছি। যার বাড়ি, তার সঙ্গে একটু কথাও বলে আসবো।

বাবলু বললো, আপনার শরীর ভালো লাগছে না, আপনি বসুন না, আমরা জল আনছি।

সূর্যকান্ত সে কথা শুনলেন না। লাফিয়ে নামলেন জিপ থেকে। একটুখানি টলে গিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, এমন কিছু

শরীর খারাপ নয় সে নিজে জল খেতে যেতে পারবো না।

কুড়েঘরটা রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে, একেবারে মাঠের মধ্যে। বাড়িটার সামনে একটা মস্ত তালগাছ। বন্দুকধারী গার্ডটি নেমে দাঁড়িয়েছে জিপ থেকে। সূর্যকান্ত একটু হেসে বললেন, তোমায় আসতে হবে না। বন্দুক নিয়ে কি কেউ লোকের বাড়িতে জল চাইতে যায়?

দু'পাশে বাবলু আর জয়দীপ, সূর্যকান্ত রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে এগিয়ে গেলেন কয়েক পা। তারপর এমনভাবে হঠাৎ ঝুপ করে পড়ে গেলেন মাটিতে যে বাবলু-জয়দীপরা তাঁকে ধরারও সুযোগ পেল না।

মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকান্তর জ্ঞান চলে গেছে।

একটুক্ষণের জন্য দিশেহারা হয়ে গেল বাবলু-জয়দীপরা। ছোটা-ছুটি করে কুড়েঘরটা থেকে জল এনে সূর্যকান্তকে খাওয়াবার চেষ্টা করলো, মাথায় জল ছেটালো, কিন্তু কিছুতেই সূর্যকান্তর সাড়া এলো না। সূর্যকান্তর মতন একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ কোন কারণে আচমকা এমন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, সে সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই নেই।

অজ্ঞান সূর্যকান্তকে নিয়ে নার্সিং হোমে পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে গেল রাত দশটা। হাসপাতালের বদলে নার্সিং হোমে নিয়ে আসার কারণ ডাক্তার সন্তোষ মজুমদার সূর্যকান্তর বন্ধু মানুষ। নার্সিং হোম ছেড়ে এক জায়গায় তাস খেলতে গিয়েছিলেন তাঁকে খুঁজে আনতে সময় লেগে গেল আরও আধঘণ্টা।

সূর্যকান্তকে একনজর দেখেই সন্তোষ মজুমদারের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি নিজেই যেন অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

সূর্যকান্তকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে এনে ওষুধ দিতে দিতে সন্তোষ মজুমদার সব ঘটনা শুনলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, জল খাবার জন্য সূর্য যে জিপ থেকে লাফিয়ে নামলো, তাতেই ওর···তোমরা ওকে জোর করে বসিয়ে রাখতে পারলে না? অবশ্য

তোমরাই বা বুঝবে কী করে ? তারপর খাদিমগঞ্জ থেকে কমলাপুর খুব খারাপ রাস্তা, জিপটা এসেছে লাফাতে লাফাতে......ইস, গাড়িটা থামিয়ে সূর্যকান্তকে যদি শুইয়ে রাখতে পারতে...ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক, এই সময় একটু নড়াচড়া করা মানেই মৃত্যুকে আরও কাছে ডেকে আনা......।

সন্তোষ মজুমদার সূর্যকান্তকে নিজের দায়িত্বে রাখতে সাহস পাচ্ছেন না। এই মফস্বল শহরের নার্সিং হোমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিছুই নেই, সব রকম ওষুধও পাওয়া যায় না, সূর্যকান্তকে বাঁচাতে হলে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া দরকার। হাসপাতালের ডাক্তার চন্দন রায় দেখতে এসে বললেন. এই অবস্থায় সূর্যকান্তকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়াও খুব বিপজ্জনক, পথেই চরম কিছু ঘটে যেতে পারে।

সূর্যকান্ত গুণ্ডা-বদমাইশদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন শুনলে কেউ অবাক হতো না। কিন্তু তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে শুনে সবাই অবাক। এমন নীরোগ, সুস্থ-সমর্থ মানুষটার হার্ট হঠাৎ বেঁকে বসলো কেন ?

আর ঠিক এগারো দিন পরে ভোট। সূর্যকান্তর জেতার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এখন কি লোকে আর এরকম একটা মুমূর্ষু মানুষকে ভোট দেবে ?

সূর্যকান্ত নিজে নির্বাচনে দাঁড়াতে চাননি। তিনি রাজনীতির লোকও নন। সূর্যকান্তর বাবা ছিলেন উকিল, তিনি শেষ বয়েসে এখানে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সূর্যকান্ত সেই কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। ছাত্রদের শুধু পড়িয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, আরও বহুদিকে তাঁর উৎসাহ। ছাত্রদের সঙ্গে খেলাধুলো করা, পিকনিকে যাওয়া, গান গাওয়া এসব তো আছেই। তাছাড়া তিনি ছুটির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের ছোট ছোট দল করে বিভিন্ন গ্রামে পাঠাতেন, যাতে গ্রামের নিরক্ষর মানুষরাও কিছুটা লেখাপড়ার স্বাদ পেতে পারে। গ্রামের মানুষদের কিছু কিছু স্বাস্থ্যবিধি বোঝানো, গাছপালা রক্ষা করা বিষয়ে সচেতন করে তোলা, এইসব কাজ নিয়েও তিনি ঘুরেছেন বহু গ্রামে। এ মহকুমার

অনেকেই তাঁকে চেনে।

এই এলাকায় আগে পরপর তিনবার এম পি হয়েছিলেন বিধুভূষণ রায়। পুরনো আমলের জেলখাটা, আদর্শবাদী মানুষ, সবাই তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই ডামাডোল চলছে। একবার বামপন্থীরা, একবার কংগ্রেসীরা জেতে। দু'পক্ষে মারামারি হয়। গত নির্বাচনে হঠাৎ জিতে গেল মানু দত্ত, নির্দল প্রার্থী হিসেবে। মানু দত্ত যে গুণ্ডা ও স্মাগলারদের নেতা, তা সবাই জানে। সে তিন-চারখানা পেট্রল পাম্পের মালিক, আর কত রকম ব্যবসা তার আছে তার ঠিক নেই। প্রচুর টাকা ছড়ায় বলে তার সাঙ্গোপাঙ্গ অনেক। গুণ্ডার সর্দারও দিব্যি ভোটে জিতে যায়। জিতে যাবার পর মানু দত্ত অন্যান্য দলের সঙ্গে দরাদরি শুরু করে দিল। সে কখনো এ দলে, কখনো ও দলে যায়। পুলিশও তাকে ভয় পায়।

সূর্যকান্ত এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি। একদিন তাঁর ছেলে নীলকান্ত বললো, বাবা, আমাদের এই মহকুমার মানু দত্তর মতন একজন বদমাশ লোক নেতা সেজে যাচ্ছে, সে চতুর্দিকে অত্যাচার করে বেড়ায়, চোর-ডাকাতদের পোষে, তবু সে লোকসভায় আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে, এটা ভাবতে আমাদের লজ্জা করে।

সূর্যকান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, সত্যি তো লজ্জার কথা। দেশটা এরকমই হয়ে যাচ্ছে। জানিস, ঐ মানু দত্ত আমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়তো। এক ক্লাসে। স্কুল ফাইনাল পাশ করতে পারেনি, তার আগে থেকেই ও স্মাগলারদের সঙ্গে মিশতে শুরু করে। এখন সে দিল্লিতে মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে।

নীলকান্ত বললো, বাবা, আমার কলেজের বন্ধুরা বলছে, তোমাকে দাঁড়াতে। মানু দত্তকে যে-কোনো উপায়ে এবার হারানো দরকার।

সূর্যকান্ত সে প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু তার পরদিন থেকে দলে দলে ছেলে এসে তাঁকে ঐ একই অনুরোধ জানাতে লাগলো। সূর্যকান্ত যতই অস্বীকার করেন ততই

তারা চেপে ধরে। এলো ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা, তারা সূর্যকান্তকে সাহায্য করবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের একটা বিরাট দল এলো ঐ একই প্রস্তাব নিয়ে।

একসময় সূর্যকান্ত নিমরাজী হলেও ঘোর আপত্তি তুললেন মমতা। রাজনীতি মানেই অনেক নোংরা ব্যাপার, অনেক মিথ্যে কথা ও গালাগাল, অন্য পার্টির ওপর কুৎসিত দোষারোপ, টাকা-পয়সায় ছিনিমিনি খেলা। এই পরিবেশের মধ্যে তিনি তাঁর স্বামীকে যেতে দিতে চান না কিছুতেই।

তখন একদল ছাত্র অনশন করতে শুরু করলো এই বাড়ির সামনে। নীলকান্তও তাদের মধ্যে একজন।

দু'দিন সেই ছেলেরা একেবারে কিছুই না খেয়ে শুয়ে থাকার পর মমতা কেঁদে ফেললেন।

তখন সূর্যকান্ত রাজী হলেন এই শর্তে যে, তিনি কোনো দলের হয়ে দাঁড়াবেন না। কারুর কাছ থেকে টাকা নেবেন না কেউ যদি গাড়ি দিয়ে সাহায্য করে কিংবা স্বেচ্ছাসেবকদের একবেলা খাওয়াতে চায় তাহলে ঠিক আছে। তাঁর নিজের বিশেষ টাকা নেই, অন্যের টাকা নিয়েও তিনি নির্বাচনে লড়বেন না।

সূর্যকান্ত নির্দল হিসেবে দাঁড়াবার পর বামপন্থী এবং কংগ্রেসীরা আলাদা আলাদা ভাবে এসে তাঁকে ধরেছিল, নিজেদের দলে আসবার জন্য। সূর্যকান্ত বলেছিলেন, আমি কোনো দলে যাবো না কেন জানেন? এক দলে গেলেই অন্য দলকে গালাগাল দিতে হয়। সত্য-মিথ্যে মিলিয়ে অনেক রকম অভিযোগ তুলতে হয়। কিন্তু আমার স্ত্রী মাথার দিব্যি দিয়েছেন, আমি কারুকে গালাগালও দিতে পারবো না, একটা মিথ্যে কথাও উচ্চারণ করতে পারবো না। আমি লড়বো শুধু সততার পক্ষে। গুণ্ডামি, অরাজকতা, মিথ্যে আর কুরুচির বিরুদ্ধে। মানুষের ভালোবাসাই আমার একমাত্র সম্বল।

ভোটের প্রচারে নেমে সূর্যকান্ত অভিভূত হয়ে গেলেন। সাধারণ

মানুষ আসলে দলাদলি, অশান্তি, ধর্মীয় বিরোধ এসব কিছুই চায় না। তিনি যেখানেই যান, হাজার হাজার লোক তাঁর কথা শুনতে আসে। মুসলমানরা তাঁকে নিজেদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। হরিজনরা চাঁদা তুলে তাঁর লোকজনদের খাওয়ায়। হিন্দুরা তাঁকে আশীর্বাদ করে। সূর্যকান্ত সব জায়গায় বলেন, আমি মন্দির কিংবা মসজিদ গড়ার পক্ষে নই, আমি চাই আরও ইস্কুল-কলেজ-হাসপাতাল হোক, গ্রামের মেয়েদের উপার্জনের ব্যবস্থা হোক। ধর্ম থাকুক যার যার বাড়িতে, আমি ধর্মের বিপক্ষে নই, কিন্তু ধর্মের নামে যারা ছুরি-বোমা চালায় তারা সবাই পাষণ্ড, অধার্মিক, আপনারাও এই কথাটা ঘোষণা করুন।

একদিন মানু দত্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। মানু বাঁকা হেসে বলেছিল, সূয্যি, তুইও শেষ পর্যন্ত লোভে পড়ে ভোটে দাঁড়ালি? তোর মতন ভালো মানুষদের জন্য এসব লাইন নয়। পারবি না, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!

সূর্যকান্তও হেসে বলেছিলেন, মানু, লোকের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তোদের লাঠি-বন্দুক চোখরাঙানি দেখেও সাধারণ মানুষ আর ভয় পাচ্ছে না। তুই এবার এসব ছেড়ে দে। নইলে দেখবি, একদিন হাজার হাজার নিরীহ মানুষ তোদের মতন লোকদের তাড়া করছে!

সূর্যকান্তর জনপ্রিয়তা যত বাড়তে লাগলো, ততই ক্ষেপে উঠলো মানু দত্ত। সে নিজের চ্যালাদের লেলিয়ে দিয়ে মারবার চেষ্টা করে-ছিল সূর্যকান্তকে। কিন্তু একদল কলেজের ছেলে সবসময় পাহারা দেয় সূর্যকান্তকে। তিনি বডিগার্ড নিতে চাননি, তবু থানা থেকে একজনকে দেওয়া হয়েছে। সবাই বুঝে গিয়েছিল, সূর্যকান্ত নির্ঘাৎ জিতবেন। তার মধ্যে হঠাৎ বজ্রপাতের মতন এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেল।

ডাক্তারদের চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায়, সূর্যকান্তর বাঁচার আশা খুব কম। কয়েকদিন বা কয়েক ঘণ্টার আয়ু আছে তাঁর।

প্রথম দু'দিন সম্পূর্ণ ঘোরের মধ্যে কাটলেও আজ সূর্যকান্তর জ্ঞান

ফিরেছে। তিনি চোখ বুঁজে আছেন, কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু তাঁর মাথা পরিষ্কার।

একটা কথাই তাঁর মনে আসছে বারবার। কেন এরকম হলো? শরীরের ওপর তেমন অত্যাচার করেননি কখনো, হৃদযন্ত্রটা তবু কেন এমন দুর্বল হলো? মানুষের জন্মমৃত্যুর কথা কিছুই বলা যায় না, তা ঠিকই। তাহলেও, মান্নু দত্তর মতন লোকেরা বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকবে, আর তাঁকে মরতে হবে অসময়ে, এটা কী রকম বিচার? কে এই বিচার করে? ঈশ্বর? তবে কি ঈশ্বর গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন? তিনি মান্নু দত্তদেরই জিতিয়ে দিতে চান?

একটু পরে তিনি চোখ মেলে নার্সকে বললেন, একবার ডাক্তারকে ডাকুন তো!

সূর্যকান্ত পরিষ্কার গলায় কথা বলছেন শুনে নার্স খুশি হয়ে দৌড়ে চলে গেল। অনেক রোগ-মৃত্যু দেখেছে এই নার্স, কিন্তু সে-ও সূর্যকান্তর জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছিল।

তক্ষুণি এসে উপস্থিত হলেন সন্তোষ মজুমদার। শুরু করে দিলেন নানারকম পরীক্ষা। সূর্যকান্ত আপত্তি জানাতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিতে পারলেন না। শরীর দুর্বল। তিনি ফিসফিস করে বললেন, সন্তোষ আর একটু কাছে আয়। সন্তোষ মজুমদার বন্ধুর খুব কাছে মুখটা আনলেন।

সূর্যকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক করে বল তো, আমার কি বাঁচার আশা আছে?

সন্তোষ মজুমদার একটু ইতস্তত করে কিছু বলতে যেতেই সূর্যকান্ত আবার বললেন, সত্যি কথা বল। আমাকে শুধু শুধু সান্ত্বনা দেবার দরকার নেই। আমি আর কখনো সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবো?

সন্তোষ মজুমদার বললেন, আমরা ডাক্তাররা আর কতটুকু জানি? অনেক কিছু অলৌকিকভাবে ঘটে যায়। তুই তো ভগবানে বিশ্বাস

করিস না, আমি করি। ভগবানের দয়া হলে তুই নিশ্চয়ই আবার সেরে উঠবি।

সূর্যকান্ত বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবানের দয়া। ভগবান কি রাগ করে আমায় এমন রোগ দিলেন ? আমি কী অন্যায় করেছি ?

সন্তোষ মজুমদার বললেন, ওসব কথা এখন ভাবিস না। কথা বলতে হবে না, চুপ করে থাক। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সূর্যকান্তর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। শারীরিক কষ্টের চেয়েও তাঁর মানসিক কষ্ট হচ্ছে অনেক বেশি। তিনি কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। মানু দত্তর মতন লোকরা এত অন্যায় অত্যাচার করেও কী করে ভোটে জেতে ? কত লোক ধর্মের নামে ছুরি শানায়, অন্য ধর্মের মানুষের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, ধর্মের নামে নৃশংস খুনোখুনি হয়, তবু লোকে ধর্ম কিংবা ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখে কী করে ?

সূর্যকান্তর অসুস্থতার খবর রটে গেছে চতুর্দিকে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা এখন প্রচার করছে যে সূর্যকান্ত বেঁচে উঠলেও কোনোদিন আর পূর্ণ কর্মক্ষম হবেন না। সুতরাং এই লোককে জয়ী করে কী হবে ?

সূর্যকান্তর সমর্থকরা মুষড়ে পড়েছে খুব। কেউ কেউ যখন তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। সূর্যকান্ত যুবসমাজকে মাতিয়ে রেখেছিলেন, এই অঞ্চলে একটা সুস্থ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তখন তারা একেবারে দিশেহারা।

সেদিন বিকেলবেলা হঠাৎ মানু দত্ত সদলবলে এলো নার্সিং হোমে। সূর্যকান্তর সঙ্গে বাইরের কারুকেই দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু মানু দত্ত ওসব বাধা মানবার পাত্র নয়। তার দলের লোকেরা চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল।

মানু দত্ত তাদের থামতে বলে সন্তোষ মজুমদারের সামনে হাতজোড় করে বেশ আবেগের সঙ্গে বললো, দেখুন ডাক্তারবাবু, আমি, আমি সূর্যকান্তর অপোনেন্ট হিসেবে আসিনি, আমি এসেছি আমার পুরনো ইস্কুলের বন্ধুকে দেখতে। সে এত অসুস্থ, তাকে একবার দেখে যাবো

না? আমি কি এতই অমানুষ?

সন্তোষ মজুমদার বুঝলেন, আপত্তি জানিয়ে লাভ নেই। তাহলে তাঁর নার্সিং হোম এরা ভেঙে দিয়ে যাবে। সূর্যকান্তর সঙ্গে দেখা করতে আসাটা নিশ্চয়ই মানু দত্তর একটা রাজনৈতিক চাল। সঙ্গে ফটোগ্রাফার নিয়ে এসেছে।

সূর্যকান্তর নাকে তখন অক্সিজেনের নল। নিঃশ্বাস খুব ক্ষীণ। কিন্তু এখনো মাথা পরিষ্কার। মানু দত্তকে চিনতে তাঁর অসুবিধে হলো না। মানু দত্ত কী বলছে তা তিনি শুনতেও পাচ্ছেন, কিন্তু উত্তর দিতে পারছেন না।

খানিকক্ষণ মামুলি সান্ত্বনার কথা বলার পর মানু দত্ত খুব কাছে এসে বললো, সূর্য, তুই আমার পুরনো বন্ধু, তোকে আমি বাঁচাবোই। মতভেদ যতই থাকুক, তবু বন্ধুকে বন্ধু দেখবে না? তোর জন্য কলকাতা থেকে আমি বড় ডাক্তার আনবো। যত টাকা লাগে লাগুক! আমার গাড়িতে ডাক্তার আনতে পাঠাচ্ছি এক্ষুণি। তোকে বাঁচতেই হবে।

হঠাৎ সূর্যকান্ত বুঝতে পারলেন মানু দত্তর আসল উদ্দেশ্যটা। সে চ্যালাদের দিয়ে বোমা ছুঁড়িয়ে সূর্যকান্তকে জখম করতে চেয়েছিল আগে, এখন সে সূর্যকান্তকে বাঁচাবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? কারণ একটাই। সূর্যকান্ত এখন হঠাৎ মরে গেলে এই কেন্দ্রে নির্বাচনই বন্ধ হয়ে যাবে। আবার কবে হবে তার ঠিক নেই। মানু দত্ত এবারে যে এত টাকা পয়সা খরচ করলো, তা বরবাদ হয়ে যাবে। আবার নতুন করে সবকিছু করতে হবে পরের বার। সূর্যকান্ত আর দশটা দিন অন্তত বেঁচে থাকলেও মানু দত্ত জিতে যেতে পারে।

সূর্যকান্তর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো, তিনি দু'দিকে মাথা নেড়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, না!

অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন, মানু দত্তকে তিনি এবার জিততে দেবেন না।

ভগবান তাঁর ওপর রাগ করেছেন কিংবা পরে আবার দয়া করবেন

কিনা, তা নিয়ে আর সূর্যকান্ত মাথা ঘামাতে চান না। অক্ষম দুর্বল হয়ে, সব রকম অবিচার মেনে নিয়ে তিনি বাঁচতেও চান না। এখনো মান্নু দত্তর মতন মানুষকে হারাবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

সূর্যকান্ত দুর্বল হাতটা তুলে নাক থেকে খুলে নিলেন অক্সিজেনের নল!

সূর্যকান্তর নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসছে, মাথার মধ্যে শুনতে পাচ্ছেন মৃত্যুর পদশব্দ। তবু তিনি ভাবতে লাগলেন, নির্বাচন স্থগিত হয়ে যাবে এখানে। আবার কয়েক মাস পরে যখন নির্বাচন হবে তার মধ্যে অন্য কেউ, আর একজন সাহসী, সত্যবাদী কেউ কি মান্নু দত্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।?

সূর্যকান্তর বুকে শেষ ধ্বনিটা এই রকম, পারবে, পারবে, পারবে, নিশ্চয়ই পারবে!

কান্না

ওভারকোটটা গায়ে চড়াতে চড়াতে বিভু জিজ্ঞেস করলো, টিঙ্কু এলো না এখনো ? আর একবার ফোন করবে ?

জয়া গলায় একটা স্কার্ফ বেঁধে নিয়েছে, বাইরে আজ কনকনে বাতাস। সেপ্টেম্বরেই তাপমাত্রা এত কমে যায় না এখানে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। জানলার পর্দা সরিয়ে একটু বাইরেটা দেখে নিয়ে জয়া বললো, টিঙ্কু আসবে না। আমি ওকে বারণ করে দিয়েছি।

বিভু রীতিমতন অবাক হয়ে ভুরু তুলে বললো, তুমি ওকে বারণ করে দিয়েছো ? কেন ?

জয়া বললো, ও কেন শুধু শুধু এখানে এসে থাকতে যাবে। ওর ছেলেমেয়ের স্কুল অনেক দূর হয়ে যায় না ?

বিভু বললো, টিঙ্কু নিজেই তো অফার করেছিল···তা হলে তুমি বাসু-সুমনাদের ফোন করো, ওদের বাচ্চাকাচ্চা নেই, কোনো অসুবিধে হবে না।

জয়া বললো, কোনো দরকার নেই। তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

ওয়ালেটে ক্রেডিট কার্ড দু'খানা আছে কি না দেখে নিল বিভু। প্লেনের টিকিটটা ওভারকোটের ভেতরের পকেটে রাখলো। তার মাথায় ঘুরছে অফিসের কাজের চিন্তা, তবু সে অস্বস্তির সঙ্গে বললো, তুমি একা থাকবে ?

জয়া বললো, তুমি এমন করছো ! যেন কেউ এখনো একা থাকে না।

বিভু বললো, থাকে, অনেকই থাকে। কিন্তু তুমি তো আগে কখনো একা থাকোনি !

দরজা খুলে বাইরের পর্চে এসে দাঁড়াতেই হাওয়ার ধাক্কায় কেঁপে

উঠলো দু'জন। মরুভূমির হাওয়া।

গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বার করে পাশের সিটে সরে বসলো বিভু! পকেটে হাত দিয়ে কী যেন খুঁজলো, না পেয়ে হাসলো। জয়াকে বললো, তুমিই চালাও!

চার মাস আগে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে জয়া। তবু বিভু যেন তার ওপর খুব ভরসা রাখতে পারে না। হাইওয়ে দিয়ে এখনো সে চালাতে দেয় না জয়াকে।

কিন্তু আজ বিভুকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে জয়াকেই গাড়িটা ফেরত আনতে হবে।

—এই, সিট-বেল্ট বাঁধলে না?

জয়া হেসে বললো, তুমি যে-কদিন থাকবে না, আমি ইচ্ছে মতন গাড়ি চালাবো। ক্যাকটাস ডেজার্টে একা যাবো। আই উইল এনজয় মাই ফ্রিডম!

বিভু বললো, বেশি বেশি কেরদানি দেখাতে যেও না। বাসু-সুমনারা তোমাকে এই উইক এণ্ডে ডেজার্টে নিয়ে যাবে। আমি তোমাকে আলবুকার্কি থেকে প্রত্যেক দিন পাঁচ ছ'বার ফোন করবো। এই, গ্যাস বন্ধ করেছো?

—হ্যাঁ রে বাবা, করেছি।

—রাত্তিরে বার্গলার্স অ্যালার্ম অন করে দিতে ভুলে যাবে না?

—না।

—না দেখে ফ্রন্ট ডোর দিনের বেলাতেও খুলবে না। রিসেণ্টলি ফিনিক্স-এ একটা ইনসিডেণ্ট হয়ে গেছে, একটা লোক এনসাইক্লো-পিডিয়া বিক্রি করার ছুতোয় এসে—

—তুমি এত চিন্তা করছো কেন, আমি কি ছেলেমানুষ?

—সাতাশ বছর বয়েস হলেও তুমি আসলে একটা বাচ্চা! এই, ডানদিকের ইনডিকেটের দিলে না, হঠাৎ টার্ন নিচ্ছো—

হাইওয়েতে পড়ার পর বিভু প্রতি মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে জয়াকে নির্দেশ

দিতে লাগলো। কখনো তার মনে হচ্ছে, জয়া পঞ্চান্ন মাইলের বেশি স্পিড তুলে ফেলছে। এক্ষুনি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশ ধরবে। কখনো মনে হচ্ছে, জয়া অকারণে লেন বদল করছে। জয়া কিন্তু বিভুর কোনো নির্দেশই মানছে না।

ওদের বাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট বেশ দূরে। পৌঁছোতে চল্লিশ মিনিট লাগলো। পার্কিং লটের দিকে জয়া যখন গাড়ি ঢোকাতে যাচ্ছে, তখন বিভু স্বস্তির হাসি দিয়ে বললো, পার্ক করার দরকার নেই। স্ট্রেট ড্রাইভ অন। আমাকে নামিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও!

জয়া বললো, কেন? আমি তোমাকে সি অফ করে যাবো!

বিভু বললো, আবার তোমাকে এতটা আসতে হবে। আমি তো চেক-ইন করেই ভেতরে ঢুকে যাবো। সময় নেই আর।

পাঁচ নম্বর গেটের সামনে এসে গাড়ি থামালো জয়া। বিভু তার কাঁধে চাপড় দিয়ে বললো, আই মাস্ট অ্যাডমিট, তোমার হাত অনেকটা স্টেডি হয়ে গেছে। তবু ফেরার সময় সাবধানে যেও!

এখানে বেশিক্ষণ গাড়ি রাখার উপায় নেই। বিভুর সঙ্গে একটা ছোট স্যুটকেস, ডিকি খুলতে হবে না। বিভুকে এক্ষুনি নেমে ভিড়ে মিশে যেতে হবে।

দেশে থাকতে যা কোনোক্রমেই সম্ভব নয় এখানে সেটাতে বেশ মজা পায় বিভু। প্রকাশ্যে চুম্বন। নানা লোকের চোখের সামনে নিজের স্ত্রীকে চুমু খেতেও একটু অন্য রকম লাগে। প্রত্যেকটি গাড়ির দিকে পুলিশের তীক্ষ্ণ নজর, এক মিনিটও থামতে দেবে না, কিন্তু তারা চুম্বনের জন্য সময় দেয়।

জয়ার কাঁধ জড়িয়ে ধরে একটি প্রগাঢ় চুম্বন দিয়ে বিভু বললো, তোমার জন্য আমার সব সময় চিন্তা থাকবে। ফেরার সময় সাবধানে যেও। প্লিজ, প্লিজ, ঘুমোতে যাবার আগে রান্নাঘরের গ্যাস নেভানো আছে কি না চেক করবে…আমি ঠিক চারদিন পরে ফিরে আসবো, তুমি এয়ারপোর্টে এসে মঙ্গলবার…আমি পৌঁছেই ফোন করবো…

জয়া বললো, তুমি কথা দিয়েছো, আর সিগারেট খাবে না। মনে থাকে যেন!

বিভু নেমে যেতেই জয়াকে স্টার্ট দিতে হলো গাড়িতে। একবার শুধু সে পেছন ফিরে তাকালো, বিভু ঠোঁটে হাত ছুঁইয়ে উড়ন্ত চুম্বন ছুঁড়ে দিচ্ছে তার দিকে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরুবার পরেই জয়ার মনটা হাল্কা ফুরফুরে হয়ে গেল। বিভু অফিসের কাজে মাত্র চারদিনের জন্য বাইরে থাকবে, এতে মন খারাপ করার কিছু নেই। এই চারদিন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। এখন এই গাড়িটা তার নিজস্ব, বাড়িতে সে একা, যখন খুশি ঘুম থেকে উঠবে।

ক্যাডিলাক গাড়িটা বিভু নতুন কিনেছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবার পর জয়া বলেছিল তাকেও একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি কিনে দিতে। সে ইচ্ছে মতন নিজের গাড়িতে সে ইউনিভার্সিটি যাবে। কাগজে বিজ্ঞাপন থাকে, মাত্র আড়াইশো-তিনশো ডলারে পুরনো ফোর্ড কিংবা টয়োটা পাওয়া যায়।

কিন্তু বিভু নানা ছুতোয় এড়িয়ে যায়, দ্বিতীয় গাড়ি কিনতে চায় না। জয়াকে সে ড্রাইভিং শিখিয়েছে এমার্জেন্সির জন্য। বাড়ির কাছ থেকেই ইউনিভাসিটির বাস পাওয়া যায়। প্রত্যেক উইক এণ্ডে জয়াকে সুপার মার্কেটে বিভুই নিয়ে যায়। বিভুর নিজেরও বাজার করার খুব শখ।

হাইওয়েতে পড়ে একসিলারেটারে চাপ দিল জয়া। বেশি স্পিড দিলে পুলিশ কীভাবে এসে ধরে, তা একবার সে দেখতে চায়! বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সে কতরকম গল্প শুনেছে। বিভু খুব সাবধানী। পুলিশ ধরলে আর কী হবে, প্রথমবার বড়ো জোর একটা টিকিট দেবে।

এদেশের পুলিশগুলো কী স্মার্ট। বেছে বেছে সুন্দর চেহারা নেয়। সব সময় ইয়ার্কি-ঠাট্টার সুরে কথা বলে। রাস্তায় কখনো কোনো পুলিশ ঘুস নিয়েছে এমন শোনা যায় না।

ষাট···পঁয়ষট্টি···আটষট্টি···পঁচাত্তর···দারুণ আরাম লাগছে জয়ার। তাকে বারণ করার কেউ নেই। সে স্বাধীন, যা খুশি করতে পারে।

ওপরে লাল-নীল আলো জ্বেলে একটা পুলিশের গাড়ি আসছে পেছনে। আসুক! জয়ার টিকিট পাবার ঘটনা শুনলে বিভু অস্থির হয়ে কীভাবে নাচানাচি করবে, তা ভেবেই হাসি পেল জয়ার।

পুলিশের গাড়িটা পাশের লেন দিয়ে আরও জোরে বেরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে একজন পুলিশ জয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলো, কিন্তু কিছু বললো না তো? যারা স্পিড লিমিট ছাড়িয়ে যায়, পুলিশ এসে তাদের গাড়ি থামাবার ইঙ্গিত করে। কিংবা সামনে রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। কিন্তু সেরকম কিছুই করলো না। বোধহয় আরও কোনো গুরুতর প্রয়োজনে ওরা ছুটে যাচ্ছে। জয়া বেশ নিরাশ হলো।

জয়া আরও বেশি নিরাশ হলো বাড়ি পৌঁছে। তার গেটের সামনে দুখানা গাড়ি।

ভেতরে ঢুকতে পারেনি, গাড়ির মধ্যেই বসে আছে দুটি দম্পতি। বাসু-সুমনা আর সুভদ্র-আইরিন। সুমনার দুই মেয়েও এসেছে।

সুভদ্র বললো, ব্রাভো! তুমি গাড়ি চালিয়ে বরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে এলে? তোমার তো অনেক ইনপ্রুভমেণ্ট হয়েছে দেখছি! আমি ভেবেছিলুম, আইরিনকে তোমার কাছে রেখে আমিই বিভুকে ছেড়ে দিয়ে আসবো!

আইরিন বললো, হাই জয়া। উই মিস্‌ড বাই ফাইভ মিনিটস! সুভোড্রো ইজ অলওয়েজ লেট, ইউ নো। খুব ওলোস!

সুমনা বললো, হাইওয়ে দিয়ে তুই একা চালিয়ে ফিরলি?

বাসু বললো, ছাখো, মাত্র দেড় বছর হলো এসেছে জয়া, এর মধ্যেই ড্রাইভিং শিখে কত স্মার্ট হয়ে গেছে। আর তুমি সাত বছরের ভেটারান, হয়েও কিছুতেই শিখতে চাইলে না।

সুমনা বললো, আমি গাড়ি ফাড়ি চালাতে পারবো না।

গ্যারাজে গাড়ি ঢুকিয়ে জয়া সবাইকে ভেতরে এনে বসালো। এখন কত রাত পর্যন্ত আড্ডা চলবে তার ঠিক নেই। সুভদ্র তো রাত ছুটো-তিনটের আগে ড্রিঙ্ক শেষ করতেই চায় না। যত ইচ্ছে মাতাল হলেও ওর অসুবিধে নেই। আইরিন মদ স্পর্শ করে না, ফেরবার সময় সে গাড়ি চালায়।

টিভি-তে আজ জেনারাল হসপিটাল ধারাবাহিক আছে। জয়া সেটা কোনোদিন মিস করে না। ডালাসের চেয়েও এই সিরিয়ালটা তার বেশি ভালো লাগে। এত লোকজন এসে পড়লে আর টিভি দেখার কোনো আশা নেই!

সুমনা বললো, টিঙ্কু ফোনে জানালো, ও থাকতে পারছে না তোর কাছে। আমার মেয়েদের এখন ছুটি। আমি তিন চারদিন থাকতে পারি তোর কাছে। কোনো অসুবিধে নেই। তুই তো কখনো একা থাকিসনি এদেশে।

জয়া একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলো।

অন্যরা কেউ সাত বছর, কেউ দশ বছর আগে এসেছে, আর জয়া মাত্র দেড় বছর আগে এসেছে, সেইজন্য সবাই তাকে অসহায়, ছেলেমানুষ মনে করে। অথচ এদেশে কত মেয়ে একা থাকে! কলকাতাতেও আজকাল মেয়েরা ইচ্ছে করলে একা থাকতে পারে।

এখানে কে কত বছর আগে এসেছে, সেটা সব সময়েই নানা কথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে যায়। জয়া এখানকার কোনো ব্যাপারে মতামত দিতে গেলেই কেউ বলে ওঠে, তুমি তো মোটে দেড় বছর এসেছো, তুমি এসব এখনো ঠিক বুঝবে না। অথচ জয়া অনুভব করে, সে আগে থেকেই বই, পত্র-পত্রিকা পড়ে যতটা জেনে এসেছে, এদেশে দশ বছর থেকেও কেউ কেউ অ্যামেরিকার জীবন সম্পর্কে ততটা জানে না। সুমনা এখনো স্কেজিউলকে শিডিউল বলে।

সুমনার মেয়ে ছুটি টিভি খুলে বিভিন্ন চ্যানেল ঘোরাচ্ছে। জয়া

এলো রান্নাঘরে খাবারদাবারের ব্যবস্থা করতে। সুমনা পেছন এসে বললো, এই, তোকে কিছু করতে হবে না, আমরা আসবার সময় গাদাখানেক ফ্রেঞ্চ-ফ্রাই আর হ্যামবার্গার নিয়ে এসেছি।

আইরিন এনেছে কেণ্টাকি ফ্রায়েড চিকেন। সুভদ্র এনেছে বার্বন-এর বোতল।

জয়া ফ্রিজ থেকে বাচ্চাদের জন্য সফ্‌ট ড্রিঙ্ক বার করলো।

সুভদ্র নিজেই গেলাস-টেলাস যোগাড় করে নিয়ে প্রথম চুমুকটা দেবার পর বললো, জয়া, এই প্রথম বিভুকে ছেড়ে একা থাকছো, তা বলে মুখখানা অমন কাঁদো কাঁদো করে আছো কেন ? আমরা কি কেউ না ?

আইরিন তার স্বামীর দিকে তাকালেই সুভদ্র বাসুকে বললো, এই, তুই আমার বউকে এই কথাটা ইংরাজিতে বুঝিয়ে দে। কাঁদো কাঁদো-র ইংরিজি কী হবে রে ?

সুমনা বললো, বিভুর প্রমোশন হয়েছে, এখন তো ওকে প্রায়ই ট্যুরে যেতে হবে।

আড্ডা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় হঠাৎ সুমনার ছোট মেয়ে রিনরিনে গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠলো, মাম্‌মি, লুক! অ্যানাদার ডিজাস্টার !

সবাই চমকে টিভি-র দিকে তাকালো।

বাসু বিড়বিড় করে বললো, আবার প্লেন ক্র্যাশ ! এয়ারপোর্টের মধ্যেই ?

সুভদ্র বললো, কী করে ছবিটা তুললো ? লাইভ দেখাচ্ছে।

জয়ার বুকটা একবার ধক করে উঠলেও সে বিশেষ ভয় পেল না। বিভুর প্লেন ছেড়ে গেছে অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে।

সুভদ্র বললো, এটা কোন্ এয়ারপোর্ট ? প্লেনটা টেক অফ করার সঙ্গে সঙ্গে আইরিন বললো, ওহ্ বয়, দিস ইজ টুসন্ এয়ারপোর্ট ! আওয়ার এয়ারপোর্ট !

বাসু বললো, তাই তো ! জিসাস ! এখানে হয়েছে ? প্লেনটা টেক অফ করার সঙ্গে সঙ্গে।

সুমনা বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভালো করে দেখতে দাও।

টিভির পর্দায় ফুটে উঠলো, ফ্লাইট নাম্বার এ এল ২৭২। তারপর নিহতদের তালিকা।

॥ ২ ॥

একটা সাদা রঙের পাতলা নাইটি পরে জয়া নেমে এলো বেজমেণ্টে। খুট খুট করে দু বার কিসের যেন শব্দ হয়েছে। জয়া ভয় পায়নি। ইঁদুরই হবে। গতকাল সে বাগানে একটা ইঁদুর দেখেছিল। মরুভূমি থেকে আসে।

সিঁড়ির আলো, বেজমেণ্টের সব আলো জ্বেলে দিল জয়া। সারা বাড়ি এখন পরিপূর্ণ নিস্তব্ধ। একটা টিভি-র ভেতরের কলকব্জা সব উন্মুক্ত করে উপুড় হয়ে আছে। বিভু এই টিভিটা নিজেই সারাচ্ছিল। টুল বক্সটা বিভু ঠিক যেখানে রেখে গিয়েছিল, সেখানেই রয়েছে। একটা সিগারেটের প্যাকেটের ওপর লাইটার।

চার দিন পর ফিরে আসবে বলেছিল বিভু, আজ ঠিক চার মাস কেটে গেল।

বিভুর দাদা-বৌদি এসেছিলেন খবর পেয়েই। তারপর জয়ার বাবা আর মা। এই চার মাস এ বাড়িটা শোকের বাড়ি ছিল না, অনবরত হুড়োহুড়ি চলছিল। সব সময় লোকজন। দূর দূর থেকে যে-যখনই সময় পাচ্ছে, একবার এ বাড়িতে এসে জয়ার সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছে। বিভু বেশ জনপ্রিয় ছিল এদেশে, প্রচুর তার বন্ধুবান্ধব।

আজ সকালে বাবা-মাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে এসেছে জয়া। প্লেনে ওঠার আগেও মা খুব কান্নাকাটি করেছিলেন, জয়ার চোখ একবারও ভেজেনি। বাবা-মা খুব করে চেয়েছিলেন জয়াকে ফিরিয়ে নিয়ে

যেতে। জয়া কিছুতেই রাজি হয়নি। শেষের দিকে বাবা-মায়ের সঙ্গে তার প্রায় ঝগড়ার মতন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম উপদেশ। জয়া এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে। সব সময় এত লোক-জন যে সে বিভুর কথা চিন্তা করারও সময় পায়নি।

আজই সে সম্পূর্ণ একা। টিঙ্কু, সুমনাদের সে প্রায় কিছুটা অভদ্র-ভাবেই বলেছে, মা-বাবা চলে যাবার প'র কারুকে এসে থাকতে হবে না তার সঙ্গে। শি উইল টেক কেয়ার অফ হারসেলফ।

কেউ কেউ কুকুর পোষার কথা বলেছিল। জয়া কুকুর পছন্দ করে না। বার্গলার্স অ্যালার্ম আছে, ভয়ের কিছু নেই। কেউ দরজা-জানলা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করলেই এখানে ও থানায় এক সঙ্গে বেল বেজে উঠবে, তিন মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে যাবে।

প্রায় দু বছর আগে এদেশে পৌঁছবার পর জয়া আর কখনো এমন একা থাকেনি। শুধু ভালোবাসা দিয়ে নয়, বিভু তাকে সর্বক্ষণ স্নেহ-মমতায় ঘিরে রাখতো। প্রথম বিদেশে এসেছে জয়া, সে অনেক কিছু জানে না, সে ভুলোমনা, সে বড়ো বেশি রোমান্টিক। এদেশে একটু অন্যমনস্ক হলেই পদে পদে বিপদ ঘটতে পারে। প্রথম যখন ইউনিভা-র্সিটির ক্লাশ শেষ হবার পরে বিভু নিয়ে আসতো জয়াকে, জয়ার লজ্জা করতো। সে কি বাচ্চা মেয়ে? সে বিভুকে বলতো, আমি কি কলকাতায় একা একা কলেজে যাওয়া-আসা করিনি? এদেশে কত রকম সুবিধে!

সারা সপ্তাহে অফিসে প্রচণ্ড খাটুনি, আর প্রত্যেক উইক এণ্ডে প্রচণ্ড উদ্দাম আড্ডা। উইক ডেইজেও ষাট-সত্তর মাইল দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে চলে আসতো কেউ কেউ।

বিভু হাসতে হাসতে বলতো, এ আর কী দেখছো? সুভদ্র, বাসু আমি, কল্যাণ, আমরা সবই যখন ব্যাচিলর ছিলাম, আমরা এক এক-দিন চব্বিশ ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে, একটুও না ঘুমিয়ে অফিস করতে গেছি!

এই শহরের পাশেই পৃথিবী-বিখ্যাত ক্যাকটাস মরুভূমি। এত দিনের মধ্যেও সেখানে একবারও ভালো করে বেড়াতে যাওয়া হয়নি। গাড়ি করে এক চক্কর ঘুরে এসেই বিভুরা আবার আড্ডা দিতে বসেছে। জয়ার খুব ইচ্ছে ছিল, ঐ মরুভূমির মধ্যে দু-এক রাত ক্যাম্প করে থাকার।

সে প্রস্তাব শুনে বিভুরা হেসেছে।

গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে যাওয়ার প্রোগ্রামই করা হয়েছে শুধু, আজও যাওয়া হয়নি।

জয়া দেশ থেকে এসেছিল জাপানের পথে। লস অ্যাঞ্জেলেস হয়ে সে অ্যারিজোনায় পৌঁছেছে। আজও তার শিকাগো-নিউইয়র্ক দেখা হয়নি। নায়েগ্রার কথা কত বইতে সে পড়েছে। বস্টন-কেমব্রিজ-শহর দেখার খুব শখ তার।

বিভুর কাছে সে প্রসঙ্গ তুললেই সে বলতো, হবে, হবে, এদেশে অনেকদিন থাকতে তো হচ্ছেই, এক এক করে সবই দেখা হবে। এত ব্যস্ততা কিসের!

সেসব কিছুই জয়াকে না দেখিয়ে বিভু চলে গেল।

এদেশের দিনগুলোকে জয়ার মনে হতো শুধু ধারাবাহিক নেমন্তন্ন। হয় অন্যের খেতে যাওয়া, অথবা নিজেদের বাড়িতে অন্যদের থাকা। তার ওপর দেশ থেকে কেউ না কেউ প্রায়ই আসে। এমনকি অচেনা মানুষও। ছোট কাকার বন্ধু কিংবা বড়দার শালার অফিসের সহকর্মী এদেশে হোটেলের খরচ বাঁচাবার জন্য একটা চিঠি নিয়ে আসে। তাদের নিয়ে গাড়িতে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখাতে হবে। বিভু অবশ্য সে ব্যাপারে খুব কড়া ছিল, বাড়িতে এসে থাকো, খাও-দাও, সেসব ঠিক আছে, কিন্তু তাদের নিয়ে সে কথাও যেতে পারবে না। অর্থাৎ যত ঝক্কি সব জয়াকে পোহাতে হয়েছে। প্রত্যেকের শপিং-এর জন্য জয়াকে সঙ্গে যেতে হয়েছে ডাউনটাউনের বিভিন্ন দোকানে।

বেজমেণ্টে ইঁদুরটাকে খুঁজে পেল না জয়া।

ভাঙা টিভি-টার সামনে সে একটা টুলে বসলো। এই ঘরে সর্বত্র এখনো বিভুর দাদা-বৌদি নিয়ে গেছে কিছু জিনিসপত্র। বন্ধুরা, অতিথিরা এসে বিছানাগুলোতে শুয়েছে।

আজ আর বাড়িতে কেউ নেই, এখন এই মাঝরাত্রির নিস্তব্ধতায় বসে বিভুর কথা ভাববে জয়া। অনেকের চিন্তা ছিল, জয়া তেমন কিছু কান্নাকাটি করেনি সে যেন অনেকটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রথম ক'দিন। তারপর অন্যদের সঙ্গে খানিকটা ঝাঁঝালো গলায় কাটা কাটা কথা বলতো। এরকম ব্যবহার ঠিক স্বাভাবিক নয়। সে বুক খালি করে কাঁদলে অন্যদের পক্ষে সান্ত্বনা দেওয়া অনেক সহজ হতো।

চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর জয়া নিজেই বেশ অবাক হলো। বিভুর মুখ তার মনে পড়ছে না, তার চোখে এখনও জল আসছে না। বরং তার শরীরে একটা চাপা আনন্দের স্রোত। মা-বাবা চলে গেছেন বলে সে এমন একটা স্বস্তি পেয়েছে যে সেই কথাই তার বার বার মনে পড়ছে। মা-বাবা কেন এখনো তাকে বাচ্চা মেয়ের মতন ট্রিট করবেন? সে কি নিজের দায়িত্ব নিতে পারে না? সে কলকাতায় ফিরে যাবে, না এখানেই থাকবে, সেটা জয়া নিজেই কোনো এক সময় ঠিক করবে। এত ব্যস্ততার কি আছে?

কিন্তু মা-বাবার চেয়েও বিভু তার জীবনের অনেকখানি বেশি অংশ জুড়ে ছিল, তাদের ভালোবাসার মধ্যে কোনো কাঁটা ছিল। বিভু হঠাৎ তাকে একেবারে শূন্য করে চলে গেছে। তবু বিভুর জন্য তার বুকে তেমন কষ্ট হচ্ছে না কেন?

জয়ার খালি মনে হচ্ছে, মা বাবা চলে গেলেন, আপাতত দেশ থেকে আর কেউ আসবে না। বিভুর বন্ধুরাও সবাই একবার করে ঘুরে গেছে। সব ফর্মালিটি শেষ। কাল থেকে সে একেবারে স্বাধীন। এদেশে আসার আগে জয়ার এই কথাটাই বেশি করে মনে হতো, এদেশে মেয়েরা অনেক বেশি স্বাধীনতা পায়! ইচ্ছে মতন কাজ, ইচ্ছে মতন ভ্রমণ। কিন্তু গত দেড় বছর, আর পরের চার মাস, সেই স্বাধীনতা

তো পায়নি জয়া। আগামীকাল থেকেই সে শুধু খাঁটি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।

সেই জন্যই কি শোকের বদলে তার আনন্দ হচ্ছে? ভালোবাসার চেয়েও স্বাধীনতার স্বাদ বেশি মধুর?

জয়া ফিসফিস করে বলে উঠলো, বিভু, বিভু, আমি তোমাকেও চেয়েছি, স্বাধীনতাও চেয়েছি কিন্তু তুমি—

বিভুর জন্য কাঁদতে পারছে না ভেবেই জয়া লজ্জায়, অনুতাপ, অনুতাপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

কপালে ধুলো মাখা

বেশ কুমড়ো ফুল উঠছে ক'দিন ধরে। কুমড়ো ফুল আমার প্রিয়। বাজারের পেছন দিকে সরু গলিটার মধ্যে যে-সব গ্রাম্য স্ত্রী-পুরুষরা আনাজপত্র সাজিয়ে বসে, তাদের মধ্যে আমি প্রত্যেকবারই কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করি। এদের কাছ থেকে শাক-সব্‌জি বা তরিতরকারি যাই-ই কিনি, তার মধ্যে খানিকটা ব্যক্তিগত ছোঁয়া থাকে। অনেকের সঙ্গেই মুখ চেনা হয়ে গেছে। দু'একজনের সঙ্গে বেশ হাসি-ঠাট্টারও সম্পর্ক, যদিও কেউ কারুর নাম জানি না।

একজন মাঝবয়েসী তরকারিওয়ালির সামনে আমি দাঁড়ালাম। অন্যদিন সে পটল-বেগুন-ঝিঙে ইত্যাদি নানারকম জিনিস বিক্রি করে। আজ তার কাছে শুধু কুমড়ো শাক। বেশ কালচে-নীল, সতেজ-টাটকা পাতাগুলো।

আমাকে দেখে সে বেছে বেছে তলা থেকে দু'তিনটে ডগা তুলে আনলো। হঠাৎ একটা খুশির রোমাঞ্চ খেলে গেল আমার সারা শরীরে। যেন এমন অপরূপ দৃশ্য বহুদিন দেখিনি।

একটা ডগায় ফুটে আছে দুটো প্রায় ফোটা হলদে ফুল। আর একটায় ফুলের বদলে ফলে আছে তিনটি কচি কুমড়ো।

দেখামাত্রই সেগুলো আর বাজারের সামগ্রী রইলো না। কোন গ্রাম্য গৃহস্থর বাড়ির মাচায় কিংবা খড়ের বাড়ির চালে লতিয়ে ওঠা কুমড়ো লতা, চতুর্দিক আলো ফুটে থাকে হলদে ফুল, আস্তে আস্তে ফুল শুকিয়ে পেয়ারার সাইজের কুমড়ো দেখা দেয়। সে বাড়ির উঠোনে ইজের পরা খালি গায়ে এক বালক দৌড়োদৌড়ি করে, তার হাতে বাঁখারির তীর ধনুক। হু-হু করে আমি পিছিয়ে যাই কয়েক যুগ, আমার

কপালে ধুলো, মা আমাকে ডাকছে।

আমি বললাম, ঐরকম ফুলওয়ালা আর কটা ডগা আছে? সবকটা আমাকে দাও।

স্ত্রীলোকটি খুঁজে খুঁজে আর একটিই মাত্র পেল।

কাছাকাছি অন্য একজনের কাছে শুধু কুমড়ো ফুল আছে অনেক। আলাদাভাবে কুমড়ো ফুল আর শাক কিনলে তো একই কথা, কিন্তু আমার ঐ ফুল সমেত শাকগুলোই চাই!

জিজ্ঞেস করলাম, শাকের সঙ্গে ফুলের জন্য তুমি আলাদা দাম নেবে?

স্ত্রীলোকটি ঠোঁটের এককোণ দিয়ে হেসে বললো, তুমি বুঝি নতুন? তোমার কাছ থেকে একটা ফুলের দাম নিয়ে আমি রাজা হবো?

এরা কত সহজে তুমি বলে! ঠিক সারল্য বলা যায় না, এদের মুখে আমি রোদ-বৃষ্টি-বাতাস মাখা একটা এলিমেণ্টাল জীবন দেখতে পাই।

লাল ময়লা ছাপা শাড়ি পরা, বয়েস হেলে যাওয়া স্ত্রীলোকটি আমার কাছ থেকে দু'চার পয়সা বেশি না নিয়ে একটু হাসি উপহার দেয়। এক এক সময় মনে হয়, এই রকম হাসি কত দুর্লভ।

যত্ন করে সে শাকগুলো আমার থলিতে ভরে দিচ্ছে, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কুমড়ো ফলে এসেছিল, এই ডালগুলো কাটলে কেন?

সে দৃষ্টি মাটিতে রেখে উত্তর দিল, কাল যে বড্ড ঝড় হয়ে গেল।

এই সময় একজন চেনা লোক আমার পিঠে হাত রাখতেই আর ওর সঙ্গে কোন কথা বলা হলো না।

চেনা লোকটি জিজ্ঞেস করলো, ফ্রেঞ্চ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দেখছেন?

কেউ কেউ বাজারের থলি হাতে নিয়েও উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি ভুলতে পারে না।

ট্রামলাইন পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে কুমড়ো শাক ও ঝড়ের বদলে আমরা আধুনিক ফরাসী চলচ্চিত্র বিষয়ে কথা বলি। আমাদের সব-

সময়ে প্রমাণ করতে হয়, আমরা অন্যদের তুলনায় কোনো ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। এরই মধ্যে দুটি না-দেখা ফিল্‌ম সম্পর্কে, শুধু পত্রিকার সমালোচনা পড়া জ্ঞানের ওপর নির্ভর করেই, আমরা মতামত জানাতে দ্বিধা করি না।

আমার চেনা লোকটি হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলো, এ কী, কামড়ে দেবে যে! কামড়ে দেবে!

আমি চমকে উঠে বললাম, কী?

দু'তিনটে মৌমাছি!

কুমড়ো ফুলের মধু খাবার লোভে এরা আমার হাতের বাজারের থলির চারপাশে ওড়াউড়ি করছে।

মৌমাছি নিয়ে অনেক কাব্য রচিত হলেও বেশির ভাগ মানুষই ওদের ভয় পায়। মানুষের মনে অপরাধবোধ আছে, তারা মৌমাছিদের শ্রমের সম্পত্তি চুরি করে। মানুষ দেখলেই মৌমাছিরা কামড়াবে, এ তো স্বাভাবিক!

এবার আমার শুধু রোমাঞ্চ নয়, সর্বাঙ্গে শিহরণ হলো। আজকের সকালটি একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। এতগুলো নতুন অভিজ্ঞতা। বাজারের থলির পাশে মৌমাছিদের গুনগুন করতে আমি তো আগে কখনো দেখিইনি। এ দৃশ্য কখনো কল্পনাও করিনি।

আমি মৌমাছিদের নিয়ে একলাইনও কবিতা লিখিনি বোধহয়, মৌমাছিদের সম্পর্কে আমার কোন ভয়ও নেই। অতটুকু কীটপতঙ্গের স্মৃতিশক্তি বলে কিছু থাকে না, ওরা মানুষ দেখলেই শত্রু ভেবে কামড়াতে আসবে কেন?

কিন্তু মৌমাছি বিষয়ে বেশিক্ষণ মনঃসংযোগ করা গেল না।

অদূরে একটা মিছিল আসছে, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার মধ্যে সেজন্য বেশি ব্যস্ততা পড়ে গেল। জোরে জোরে হর্ন ছোটাছুটি, মিছিলটা এসে পড়ার আগেই সবাই পালিয়ে যেতে চায়।

পরিচিতি ব্যক্তিটি আমার হাত ধরে টানলো, আমিও দৌড়ে রাস্তা

পেরিয়ে গেলাম। মৌমাছিরা হাল ছেড়ে দিয়ে আর এদিকে আমাকে অনুসরণ করে এলো না। ওরা কি পথ চিনে ফিরে যেতে পারবে ওদের মৌচাকে ?

আমার উচিত ছিল বাজারের থলিটা নামিয়ে রেখে একটুক্ষণ এক-পারে সরে দাঁড়ানো। মৌমাছিগুলো কুমড়ো ফুলের মধু খেতে এসে-ছিল। ওটা ওদেরই প্রাপ্য। কতটুকুই বা মধু। আমাদের তো কোন কাজে লাগবে না। আমার হাতের চলন্ত থলিতে ওরা ঠিক বসতে পারছিল না। মিছিলটা এসেই সব গোলমাল করে দিল।

অল্প সর্ষে-বাটা দিয়ে, কুচো চিংড়ি মিশিয়ে কুমড়োর শাক অনবদ্য। আর একটু ব্যাসম বুলিয়ে মুচমুচে কুমড়ো ফুল ভাজার স্বাদের কোন তুলনা হয় না।

খেতে বসে আমার মনে হলো, এই ফুলগুলো সাধারণ বাজারে কেনা ফুল নয়। একজন আমাকে উপহার দিয়েছে। ভাজা খাওয়ার বদলে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখাই কি ঠিক ছিল ?

কুমড়োর ফুল কিংবা কচুরিপানার ফুল, এদের রূপ অন্যান্য অনেক ফুলের চেয়েই কোন অংশে কম নয়। তবে এদের একটাই দুর্বলতা, ছেঁড়ার একটু পরেই নেতিয়ে যায়। গোলাপ কিংবা রজনীগন্ধা নিশ্চয়ই ভাজা করে মোটেই ভাল লাগে না।' নাহলে মানুষ ওদেরও ছাড়তো না।

যে স্ত্রীলোকটি আমাকে এই কুমড়োর শাক দিল আজ, তার বাড়ি কোন্ গ্রামে ? এসব কথা কখনো জিজ্ঞেস করা হয় না। ওদের গ্রামে কাল খুব ঝড় হয়েছিল, অথচ আমাদের এখানে ঝড় বৃষ্টির নাম-গন্ধও নেই।

ঝামা-ঘষা রোদের মধ্যে বেরুতে হলো বাড়ি থেকে।

এইসব দুপুরে রাস্তার অধিকাংশ মানুষেরই ভুরু কোঁচকানো থাকে। অফিসের লোকরা কথা বলে ঝিমোনো চোখে। ট্রামলাইন, ডিজেলের ধোঁয়া, ভাঙা রাস্তা এসব কতকাল ধরে দেখছি, দেখেই যাই কিন্তু ওদের

সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই। এই একটি রিকশাওয়ালার মুখ দেখলে মনে হয়, ঠিক ঐ লোকটিই অন্তত একশো বছর ধরে এই শহরে রিকশা চালাচ্ছে। অথচ ওর সঙ্গে কখনো আমি কথা বলিনি।

অফিসে নানা ধরনের ব্যস্ততায় সময় কেটে যায়। তার মধ্যেই হঠাৎ একসময় খেয়াল হলো, বই, কাগজপত্র অ্যাশট্রে, টেলিফোন, টেবিল, কাচের ঢাকনা টিউব লাইট, এই যে সব বস্তু পরিবৃত হয়ে রোজ কয়েকঘণ্টা কাটাই, তার সবকটাই কৃত্রিম। কোন না কোন যন্ত্র এগুলিকে বানিয়েছে। প্রকৃতির কোন রকম মৌলিক উপাদানের সঙ্গে এখানে চাক্ষুষ সম্পর্কও নেই। জানলা দিয়ে বাইরের কিছু দেখা যায় না। তাতে কিছু অসুবিধেও বোধ করি না।

মাটির উঠোনে ইজের পরা, খালি গায়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে, তার কপালে ধুলো, সে এখন কত দূরে।

অমিত আর দীপা আগামী সপ্তাহে ফ্রাঙ্কফুর্ট চলে যাচ্ছে। ওদের বাড়িতে আজ সন্ধেবেলা যাবার কথা। যাওয়াটা খুবই উচিত, অথচ যেতে ইচ্ছে করছে না। অথচ আজকের বদলে কাল বা পরশু যাওয়া যাবে না। ওরা খুবই ব্যস্ত থাকবে।

রাস্তায় বেরিয়েও আমি ইতস্তত করি। নিজের বাড়ি আমাকে টানছে, অথচ যেতে হবে অমিতদের বাড়িতে। প্রত্যেকদিন কত ছোট-খাটো স্বাধীনতা আমরা হারাই কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কেন অমিতদের বাড়িতে তোমার যেতে ইচ্ছে করছে না, আমি তার উত্তর দিতে পারবো না। অমিতের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের ভেতরে ভেতরে কোনরকম টেনশন নেই। ওদের দুজনকেই দেখলে আমার ভাল লাগে, হালকা গল্প হয়।

কাঁধ উঁচু করে আমি একটা ট্যাক্সি ডাকলুম। এখনো পুরো সন্ধে হয়নি, আকাশ বারুদবর্ণ।

একটা বাচ্চা কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিল। দূর থেকে উঁকি মেরে দীপা বললো, তুমি একটু বসো। আমি আসছি। গা-ধোওয়া

হয়নি। দশ মিনিট লাগবে। তুমি চা খাবে? বসবার ঘরটি ছোট হলেও বড় বেশি আসবাবপত্র। দুটো কাচের আলমারি। আন্দামান থেকে আনা একগাদা সামুদ্রিক ঝিনুক ও শাঁখ। দু'দিকের দেয়ালে দুটি ছবি। আমার মুখোমুখি ছবিটা ভ্যান গঘের আত্মপ্রতিকৃতির প্রিণ্ট।

সেদিকে তাকিয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমার একটা কথা মনে পড়লো।

কুমড়ো ফুল লোকে বিক্রি করে কেন? ফুলের চেয়ে কুমড়োর দাম অনেক বেশি। ফুলগুলো গাছে রেখে দিলেই তো কিছুদিন পরে কুমড়ো হতে পারে। নাকি, সব ফুল থেকে ফল হয় না? কিংবা, খুব পয়সার দরকার হলে ওরা আর অপেক্ষা করতে পারে না। সামান্য দামে ফুল বিক্রি করে দেয়? এইসব অতি সাধারণ ব্যাপারগুলো আমরা জানি না কেন?

ঝড় হলে কি কুমড়ো গাছের ক্ষতি হয়? বড় গাছেই তো ঝড়ের আঘাত লাগে।

কিংবা ঝড়ের ধাক্কায় কঞ্চির মাচা কিংবা খড়ের চাল উড়ে যেতে পারে। তখন কুমড়ো গাছটাকে কুমড়ো শাক করে বিক্রি করে দিতে হয় বোধহয়। এ সবকিছুই জানা হয় না, মাঝখানে ফরাসী সিনেমা এসে বাধা দেয়। সারা ঘরে সৌরভ ছড়িয়ে দীপা ঢুকে বললো, আমরা এক্ষুণি বেরুবো। অমিত বাড়িতে ফিরতে পারছে না। টেলিফোন করেছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে বললাম, তোমাদের অন্য জায়গায় নেমন্তন্ন আছে বুঝি? ভালই হয়েছে, আমারও একজাগায় নেমন্তন্ন ছিল। না গেলে খারাপ দেখাতো। দীপা ধমক দিয়ে বললো, মোটেই তুমি অন্য কোথাও যাচ্ছো না। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

মুখের আলো নিভিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়?

দীপা ধমক দিয়ে বললো, অমিত অফিসের কাজে আটকে গেছে একটু দেরী হবে। সন্ধের সময় আবার দুজন বাইরের লোকের সঙ্গে

অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়েছে ক্লাবে। বাড়িতে ডাকলে খাওয়াতে হয়, রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট। ক্লাবেই বসা হবে। ও বলেছে তোমাকেও ক্লাবে নিয়ে যেতে।

—আমি না গেলে কিছু ক্ষতি হয়? অমিতের সঙ্গে পরে দেখা করে নেবো।

তোমাকে যেতেই হবে। ও বাইরের অচেনা লোকদের সঙ্গে কাজের কথা বলবে, আমি সেখানে একা একা কী করবো?

—শোনো, দীপা। আজকের দিনটায় কোন এয়ারকণ্ডিশান্ড ক্লাবঘরে, দরজা-জানলা বন্ধ, গুমোটের মধ্যে বসতে একটুও ইচ্ছে করছে না আমার।

—এ-সি রুমে তোমার বসতে ইচ্ছে করছে না? কেন?

—এক একদিন মানুষ একটু অন্যরকম হয়ে যায় না?

—তুমি সত্যিই আজ কেমন যেন গোমড়া মুখ করে আছো। তোমার কী হয়েছে বলো তো? মনে হচ্ছে, তুমি অন্য কোন লোকের জামাকাপড় পরে আছো। যাই হোক, শোনো, আমাদের ক্লাবে এসি রুম ছাড়াও চমৎকার বাগান আছে। সুইমিং পুলের পাশে খোলা জায়গায় বসা যায়। আজ যদি ঝড় ওঠে, তাহলে আরও ভাল লাগবে। চলো, চলো, এরপর আবার কতদিন দেখা হবে না!

—জার্মানি যাচ্ছো বলে তুমি উৎসাহে খুব টগবগ করছো দেখছি!

—আমাকে দেখে তোমার এরকম মনে হচ্ছে? দীপার গলার আওয়াজে হঠাৎ এমন একটা ভেজা সুর পেলাম যে চমকে মুখ তুলে তাকে আবার দেখলাম। একখানা বেশ ঝলমলে সোনালি রঙের শাড়ি পরেছে সে, স্নান করার পর সব মেয়েরই চোখ বেশি টানটান লাগে, বেশ ভালই সাজগোজ করেছে দীপা, তবু তার মুখখানা যেন একটু ম্লান। জিজ্ঞেস করলাম, কেন, জার্মানি যাচ্ছো বলে তুমি খুশি নও?

—আমার একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না!

সে কি? কেন?

—সব কেন'র কি উত্তর হয়!

দীপার কাছ থেকে এরকম অনুত্তর একেবারেই আশা করা যায় না। দীপার সব ব্যবহারের মধ্যেই একটা কার্য কারণ থাকে। এক একসময় মনে হয় সব কথাবার্তাই অবান্তর। শুধু দীপার এই চুপ করে যাওয়াটাই তাৎপর্যপূর্ণ।

অমিত গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে, আমাদের ট্যাক্সি খুঁজতে হলো না। যাবার পথে একটা দোকানে থেমে দীপা কী যেন কেনাকাটি করলো। সেই সময়টায় আমি একা বসে আছি গাড়িতে, আমার গায়ে যেন একটা ঢেউ লাগছে। যেন এক্ষুনি এখান থেকে আমার অনেক দূরে চলে যাবার কথা। কোথায়?

দীপাদের ক্লাবের বাইরের পরিবেশটি সত্যিই মনোরম।

গ্রীষ্মের আকাশে এখনো পুরোপুরি অন্ধকার নামেনি। কোথায় ঝড়? দূরে বড় বাড়ির আড়াল।

এরই মধ্যে বেশ একখানা বাগান, মাঝখানে পুকুর। পেছন দিকটায় কয়েকটি বড় বড় গাছের ডালপালা মিলে একটা জঙ্গল ভাবও মনে করা যেতে পারে।

পুকুরের জল এমন গাঢ় নীল হয় না। তাই এর নাম সুইমিং পুল। যেন এক চামচে সমুদ্র। চারদিকের পার বাঁধানো অর্থাৎ চৌবাচ্চার মধ্যে সমুদ্র। ফুলগাছগুলি সারিবদ্ধ। প্রকৃতির গাছপালা কখনো লাইন বেঁধে দাঁড়ায় না। বাগান করার সময় একথা মনে রাখে না মানুষ? কিংবা মানুষ প্রকৃতিকেও তৈরি করতে চায়।

এইসব কথা আজই মনে পড়ছে আমার। দুপুরে অফিসে গিয়ে আজই প্রথম খেয়াল করেছিলুম যে ঘরের মধ্যে একটাও স্বাভাবিক জিনিস নেই।

অমিত এখনো এসে পৌঁছোয়নি। পুকুরটার চারপাশে ঘুরতে লাগলাম আমি আর দীপা। কিছু লোক রঙিন ছাতার নিচে বসে আছে। জলে ঝাপান ঝাপান করছে কয়েকটি জাঙ্গিয়া ও গেঞ্জি পরা

যুবক-যুবতী। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে দীপা বললো, গত বছরে একদিন এখান দিয়ে হাঁটছিলুম। বেশ ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছিল। হঠাৎ টপাস করে আমার সামনে একটা আম পড়লো গাছ থেকে!

আমি প্রবল অবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, যাঃ, কী বলছো! হতেই পারে না! বাজে কথা। দীপা হকচকিয়ে গিয়ে বললো, আমি বাজে কথা বলবো কেন? এটা তো আম গাছ।

যেন এটা একটা অকল্পনীয় গল্প, সেইভাবে আমি বললাম, এটা আম গাছ? ঝড়ে আম পড়েছিল?

দীপা বললো, তুমি আমগাছও চেনো না? এবারেও বোধহয় আম হয়েছে। অবশ্য এখনও বৃষ্টি হলো না।

আমি ওপরের দিকে তাকালাম। গাছটার ওপর একসঙ্গে অনেক কাক ও শালিক ডাকছে।

এতবড় বাগানে আম গাছ থাকা আশ্চর্য কিছুই না। জোর বাতাসে আম গাছ থেকে একটা-দুটো আম খসে পড়তেই পারে। কিন্তু কলকাতা শহরে এরকম কথা আমি যেন আগে কখনো শুনিনি।

সেই আম গাছের কাছেই কতকগুলো গাঁদা ফুলের ঝাড়। এই গাছগুলো বোধহয় কেউ লাগায়নি। আপনি আপনি জন্মেছে। সেইরকমই এলোমেলো ভাব।

দীপা সেই গাঁদা ফুলগুলোতে হাত বুলোতে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, উঃ, মরে গেলুম! মরে গেলুম!

—কী হলো?

—কামড়ে দিয়েছে! উঃ, উঃ, মৌমাছি!

—যাঃ! কী বলছো?

—তুমি কী, সুনীলদা? নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছো না? জ্বালা করছে, ভীষণ জ্বালা করছে!

সত্যিই তো, তিন চারটে মৌমাছি ভন ভন করে উড়ছে দীপার চারপাশে। এইরকম শৌখিন ক্লাবে মৌমাছির উৎপাত? সকালবেলা

যে মৌমাছি কটাকে দেখেছিলাম সেগুলোই নাকি ?

দীপা প্রায় নাচতে শুরু করেছে। বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তার আঁচল।

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। দীপা নাচ থামিয়ে চোখ গোল গোল করে তাকাতেই আমার লজ্জা হলো। ওর এই অবস্থায় আমার হাসা উচিত নয়। আমার এই হাসিটা ব্যাখ্যা করা যাবে না।

অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করতে হলো বিছানায়। ঘুমের কোন নাম-গন্ধই নেই, এক এক রাতে এরকম হয়। চোখ বুজলেই টুকরো টুকরো ছবি এসে ভেঙ্গে যাচ্ছে। টুকরো টুকরো কথা। দীপা কেন বললো, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি অন্য কারুর পোশাক পরে আছেন ? আসলে আমি কোন পোশাকই পরে নেই। বিছানা থেকে একটা ঢেউয়ের ধাক্কা আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে অন্য কোথাও। আমি আজ অন্যান্য দিনের মতন আমি নই।

দীপাকে সত্যিই একটা মৌমাছি কামড়ে দিয়েছে। তাতে এমন কিছু লাগে না, দীপা বেশি ভয় পেয়েছিল। ক্লাবেই ফার্স্ট এইড বক্স ছিল, একজন ডাক্তারও পাওয়া গেল মেম্বারদের মধ্যে, ঐ সামান্য ব্যাপার নিয়ে কী আদিখ্যেতা।

দীপা বারবার রাগ-রক্তিম নয়নে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। যেন আমারই দোষ ? মৌমাছিগুলো আমিই পাঠিয়েছি ?

একইদিনে পরপর এরকম ঘটে যায় ! কুমড়ো ফুল, কুমড়ো ফুলের মধু ...।

ওদের গ্রামে কি ঝড় এসেছিল মাঝরাত্রে ? বাঁশের মাচা আর খড়ের চাল উড়ে গেছে। কুমড়ো লতাগুলো বাঁচানো যাবে না, তাড়াতাড়ি ডগাগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে ফুল আর কচি কুমড়ো সমেত। এই দৃশ্য আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

ঝড়ে কত ফুল-ফলের গাছ উল্টে গেছে কে জানে। ভোরবেলা মৌমাছিরা এসে কিছুই পায়নি। ক্ষুধার্ত মৌমাছিরা কি শহর পর্যন্ত

উড়ে আসে ?

আমি কতবার দেখেছি ঐ ঝড়। সমুদ্রের মতন শব্দ। বড় বড় গাছগুলোর মাথা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। টপটপ করে খসে পড়ছে কাঁচা আম। চতুর্দিকে উড়ছে জামরুল ফুলের রেণু। খালি-গা, ইজের পরা একটা বাচ্চা ছুটোছুটি করছে। তার কপালে ধুলো।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা ডাকছে। তরঙ্গে তরঙ্গে মিশে যাচ্ছে সেই কণ্ঠস্বর। ঝড়ের শব্দ ছাড়িয়েও শোনা যায় মায়ের ডাক। তবু সেই কপালে ধুলো মাখা ছেলেটা দৌড়ে চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।